ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ।। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৩১ মে, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

মন্টেককে মোদীর মোক্ষম জবাব

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এরকম মুখের মতো জবাব আদৌ আশা করেননি প্ল্যানিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া। নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদীই। নিজ রাজ্য গুজরাটের ব্যাপারে বরাদ্দ ঠিক করতে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য শ্রীমতী সৈয়দ হামিদ। তিনি বৈঠকেই

মোদী মন্টেক

মোদীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি বঞ্চনা ও অবহেলার অভিযোগ তুললেন। বললেন, আমেদাবাদ শহরের জুহুপুরা মুসলমান মহল্লাতে মুসলিম ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কোনও স্কুলই নেই। মোদীর চটজলদি জবাব। একেবারে স্থান উল্লেখ করে ওই এলাকায় ছয়-ছয়টি স্কুলের অবস্থান জানিয়ে দিলেন। আরও বললেন, প্ল্যানিং কমিশনের একজন সদস্য এভাবে অভিযোগ জানাতেই পারেন না। এটা নীতি-প্রথা বহির্ভূত।

এবার মোদীরই কৈফিয়ৎ তলব করার পালা। একজন প্যানেল মেম্বার কি করে জন-অভিযোগে সামিল হন? এ ঘটনা ২০ মে তারিখের। এর আগে ১৮ মে আলুওয়ালিয়া এক চিঠি দিয়েছিলেন মোদীকে। সেখানে তিনি গুজরাটে ৯.১ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার উল্লেখ করে জানিয়েছেন, রাজ্যে মাত্র ৪.৭ শতাংশ মুসলমান ছাত্র রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষায়। আর উচ্চ প্রাথমিকে মাত্র ৪.৮ শতাংশ ছাত্র মুসলমান। এই বৈষম্য দূর

(এরপর ৪ পাতায়)

প্রত্যাঘাতই মাওবাদী দমনের উপযুক্ত পথ

।। গুরুপুরুষ ।। চিঙ্গাবরম। ছত্তিসগড় রাজ্যের ঘন জঙ্গলে ঘেরা একটি পাহাড়ি গ্রাম। ১৭ এপ্রিল সোমবার বিকেলে এখানেই মাওবাদীদের ল্যাণ্ডমাইনে উড়ে যায় একটি যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাস্থলেই নিহত হন ৪০ জন বাসযাত্রী। এদের মধ্যে অন্তত ৩০ জন দরিদ্র খেটে খাওয়া নিরপরাধ বনবাসী। অন্য ১০ জন নিরাপত্তা কর্মী। এই নিরাপত্তাকর্মীরা সকলেই গ্রামে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান। সংসারে একটু আর্থিক স্বাচ্ছল্য আনতে তারা নিরাপত্তা কর্মীর চাকরিতে ঢুকেছিল। মাওবাদীদের লাল চোখে এই নিরাপত্তা কর্মীরা "জন বিরোধী স্বৈরতান্ত্রিক ভারত সরকারের ভাড়াটে খুনী"। এদের হত্যা করতেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু অন্য ৩০-৩৫ জন নিহত নিরপরাধ বাসযাত্রীর অপরাধটা কী? মাওবাদী তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীরা কু-যুক্তি দেখাবেন গণশত্রুদের খতম করার গণযুদ্ধে অনেক সময় নিরপরাধ সাধারণ মানুষের প্রাণ যায়। অনেক মূল্য দিতে হয়। এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মানবেন না যে মাওবাদীরা আদতে সন্ত্রাসবাদী। তারা হত্যা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভারতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চায়। তারা গণতন্ত্র, নির্বাচন, সংসদীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে না। তারা ভারতে মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চায়। তারা জানে যে তাদের হিংসার রাজনীতির পিছনে জনসমর্থন নেই। তাই সন্ত্রাসের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের খোয়াব দেখছে।

মাওবাদী হামলায় নিহতের খতিয়ান

বছর	মাওবাদী হামলা	নিহত	সাধারণ মানুষ	নিরাপত্তা কর্মী
২০০৯	২,২৫০	৯০৫	৫৯০	৩১৫
২০১০ (এপ্রিল পর্যন্ত)	৮১০	৩৪১	১৯৫	১৪৬

ভারত বিরোধী কিছু সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠি দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য অন্তর্ঘাত চালাতেই পারে। কিন্তু এই অশুভ শক্তিকে দমন করতে ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এমন ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণটা কী, বোঝা যাচ্ছে না। ছত্তিশগড়ে বিজেপি এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার আছে। বিজেপি এবং কংগ্রেস দুই রাজনৈতিক দলই মাওবাদীদের দেশের এক নম্বর শত্রু বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু দেশের এই শত্রুদের বিনাশ করার লড়াইতে তেমন যুক্ত প্রয়াস দেখা যায়নি। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাজের সমন্বয়ের অভাবেই গত ৬ এপ্রিল দান্তেওয়াড়া জেলার চিন্তলনার এলাকায় মাওবাদী হামলায় ৭৬ জন সি আর পি এফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। তারপরে ৮ মে বিজাপুর জাতীয় সড়কে মাওবাদীদের পাতা মাইন বিস্ফোরণে ৮ জন সি আর পি এফ জওয়ানের মৃত্যু হয়। এরপরেও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও শিক্ষাই নেয়নি সোমবারে চিঙ্গাবরমের ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

মাওবাদী দমনে শুধুই সরকারি ব্যর্থতা নয়, জোরদার জনমত গড়তে হবে মাওপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং তথাকথিত মানবাধিকার রক্ষা সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে। জবাবদিহি চাইতে হবে নিরপরাধ নিরস্ত্র সাধারণ বাসযাত্রীদের হত্যার দায় তারা নেবে না কেন? এই বুদ্ধিজীবীরা এবং স্বেচ্ছা সংগঠনের নেতারা এতকাল গলা ফাটাচ্ছিলেন এই কথা বলে যে; 'অস্ত্র নয়, উন্নয়নই মাওবাদী সমস্যার সমাধান করবে'। এই তত্ত্ব আদতে মাওবাদীদের মহান করার অপচেষ্টা মাত্র। এরা বোঝাতে চাইছেন যে উন্নয়নের দাবিতেই অবহেলিত জঙ্গল এলাকায় মাওবাদীরা অস্ত্র ধরেছে। নির্বিচারে হত্যা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ অসত্য কথা। উন্নয়ন নয়। হিংসার পথে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্যই মাওবাদীরা জঙ্গলে চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে। এই সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানোর অর্থ দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। তাই মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় অস্ত্র ও উন্নয়ন প্রকল্প দুইই সমানভাবে ব্যবহার করাই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র লক্ষ্য ও কর্তব্য হওয়া উচিৎ। মনে রাখতে হবে যে মাওবাদীরা বিশ্বাস করে বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। তাদের কাছে অহিংসা ও শান্তির বার্তা দুর্বলতা কাপুরুষতারই নামান্তর। তাই সশস্ত্র প্রত্যাঘাতই একমাত্র পথ। এই সহজ ও সরল কথাটি ভারত সরকার যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই মঙ্গল।

জনগণনায় জাতপাতের বিরোধী আর এস এস – ভাইয়াজী যোশী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জাত-পাতভিত্তিক জনগণনার তীব্র সমালোচনা করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। গত ২৩ মে নাগপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ (সাধারণ সম্পাদক) ভাইয়াজী যোশী বলেন, আর এস এস জাত-পাতবিহীন সমরসতা যুক্ত সমাজ নির্মাণে কৃত সংকল্প এবং সদাসচেষ্ট। আর এস এস এব্যাপারে অন্যতম সংবিধান নির্মাতা প্রয়াত ডঃ বি আর আম্বেদকরকে অনুসরণ করে চলে। শ্রীযোশীর কথায়—জাত-পাতের উল্লেখ করা হলে মানুষের ভাবাবেগকে আঘাত করা হবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণনার সময় ভারতে বসবাসকারী অবৈধ অভিবাসীদের বিষয়ে কোনও স্পষ্ট নীতি নির্দেশিকাই নেই। তাদেরকে কিভাবে চিহ্নিত করা হবে? একবার জনগণনায় নাগরিক সূচীতে অর্থাৎ ন্যাশানাল পপুলেশন রেজিস্টারে (এন পি আর) ঢুকে পড়লে তারা তো বৈধতা পেয়ে যাবে। যা দেশের নিরাপত্তা ও একতার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপদ।

আর ওই নাগরিক সূচীকে ভিত্তি করেই তৈরি হবে বহুমুখী পরিচয়পত্র। সেজন্য আর এস এস-এর দাবী হলো, জাতীয়তার সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই পরিচয়পত্র দেওয়া হোক এবং জাতীয় নাগরিক সূচীতে সামিল করা হোক। জাতীয়তাই (Nationality) হবে এক্ষেত্রে একমাত্র মাপদণ্ড।

এছাড়া ওবিসি-দের সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রেও ও বি সি হিসেবে কারা তালিকাভুক্ত হবেন তারও স্পষ্ট যোগ্যতা ঠিক করা দরকার। একটি প্রদেশে যারা ওবিসি, সেই গোষ্ঠীই অন্যপ্রদেশে নয়। এজন্য জাতীয় স্তরে আলোচনা হওয়া উচিত। সঙ্ঘ ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণের বিরোধী নয়। তাড়াহুড়ো না করে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গেও এই বিষয়ে কথাবার্তা বলা দরকার। বিজেপি ওবিসি চিহ্নিত করার যে দাবী করেছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শ্রীযোশীর জবাব ছিল—ওটা বিজেপি-র ব্যাপার। তাদের নীতি তারাই ঠিক করবে। জনগণনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। মাঝপথে জাত-পাত, ওবিসি প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সূত্র অনুসারে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—জাত-পাত ভিত্তিক জনগণনার ব্যাপারে মন্ত্রীসভা ক'দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবে।

দলতন্ত্রের হীন খপ্পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

অচিন্ত্য বিশ্বাস।। ১৮৯৩-এর ৩ জুলাই শোভাবাজারে গড়ে ওঠে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব্ লিটারেচার'; সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব (১৮৬৬-১৯১২), সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী (-১৯০৩)। পরের বছর সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৩.৮.১৮৪৮-৩০.১১.১৯০৯)-কে সভাপতি করে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব্ লিটারেচার' হলো 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'। আজ ১১৭ বছর ধরে চলছে বাংলার এই গৌরব-উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান। চলছে বললাম, কিন্তু গত তিনটি দশক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রহণ লেগেছে।

১৯০৯ সালে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯৩০)-র অর্থানুকূল্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর বর্তমান ঠিকানায় গড়ে ওঠে নিজস্ব ভবন। ২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ পরিষৎ-এর 'স্বগৃহ-প্রবেশ-উৎসবে' যোগ দিয়েছিলেন। ভবনের দ্বার-উন্মোচন করেন তিনি। পরিষৎ ভবনকে তিনি 'মন্দির' বলে অভিহিত করেন। বছর কয়েক আগে পরিষৎ-এর বর্তমান সম্পাদকমশাই আমাকে বলেন—পরিষৎ ভবনকে মন্দির বলার পক্ষপাতী নন তিনি, এতে অন্য ধর্মের লোকেদের মনে আঘাত লাগতে পারে। আমি তাজ্জব। বললাম, মন্দির শব্দটি পুরানো বাংলায় দেবালয় নয়—যে কোনও আবাসকেই মন্দির বলতাম আমরা। নজরুল ইসলাম তো তাঁর কবিতায় বহু বার 'মন্দির' শব্দ প্রয়োগ করেছেন—মাইকেল মধুসূদনও। ভদ্রলোক বললেন, পুরানো সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু জানেন না।

১৯৬৩ নাগাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (৯.৫.১৯০০-১৭.৬.১৯৭২)। সে লেখার এক জায়গায় আছে—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা অবধি

আজ প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলিয়া আসিতেছে।...বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, প্রাচীন পুঁথির বিবরণ সংকলন ও প্রকাশ এবং প্রাচীন গ্রন্থের গবেষণামূলক সংস্করণ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করে।' রবীন্দ্রনাথও 'সাহিত্য পরিষৎ'-কে এভাবেই দেখতে চেয়েছেন। 'দেশের ভাষা পুরাবৃত্ত সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক দিয়া দেশকে জানিবার' চেষ্টা করাই সাহিত্য পরিষৎ-এর কাজ। (দেখুন ঃ 'সাহিত্য পরিষৎ'; চৈত্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। দেশের পুরানো ভাষা, ইতিবৃত্ত, সাহিত্য যারা জানেন না—শ্রদ্ধা করেন না, তারা আজ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' দখল করেছেন!

এমন অবস্থা প্রথম দিকের পরিষৎ-নেতৃত্ব ভাবেননি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৬.১২.১৮৫৩—১৭.১১.১৯৩১), বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (২০.৮.১৮৬৪—৬.৬.১৯১৯), দীনেশ চন্দ্র সেন (৩.১১.১৮৬৬—২০.১১.১৯৩৯), বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ (১২.৯.১৮৬৫ —৯.১১.১৯৫২), প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু (৬.৭.১৮৬৬—১০.১৯৩৮), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮—১৯৪২), আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (৩০.৯.১৮৬৯—৩০.৯.১৯৫৩), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১০.৭.১৮৮৫—১৩.৭. ১৯৬৯), আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (২৬.১১. ১৮৯০—২৯.৫.১৯৭৭), সজনীকান্ত দাস (১৫.৮.১৯০০—১১.২. ১৯৬২), সুকুমার সেন (১৬.১০. ১৯০০ —৩.৩.১৯৯২), শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৭.২.১৯১১-২১.৭.১৯৬৪)—প্রভৃতি অজস্র জ্ঞানী-চিন্তাশীল-বিদ্বজনের ধারবাহিক চেষ্টা, নিষ্ঠা, কর্মশক্তিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এরা কেউই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞ ছিলেন না।

(এরপর ৪ পাতায়)

মালদার পর্যটন মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে পাতালচণ্ডী

তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদা।। মালদা জেলার প্রাচীন, ঐতিহাসিক তীর্থ তথা পর্যটন কেন্দ্র পাতালচণ্ডী ধাম যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি সংস্কারের জন্য জেলা প্রশাসন অবশেষে অর্থ বরাদ্দ করল। গত ২৪ এপ্রিল থেকে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয় ১০০ দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে। এই রাস্তাটি একশো বছরেরও বেশী সময় ধরে সাধারণ মানুষ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহার করলেও বর্ষার দিনে যাতায়াত করা প্রায় সম্ভব ছিল না। মালদা জেলা পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত অ্যাডিশনাল এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং এ ডি এম কাজল চক্রবর্তীর বিশেষ প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় মানুষের গণসাক্ষরের ভিত্তিতে এই রাস্তাটি তৈরির কাজ শুরু হলেও কয়েকজন রাস্তার কাজে বাধার সৃষ্টি করে। এই পাতালচণ্ডী যাওয়ার রাস্তাটি ১৪ জন বাগান মালিকের জমির উপর দিয়ে গিয়েছে এবং দীর্ঘ দিন রাস্তাটি ব্যবহার করার ফলে তারা রাস্তাটি পিচ-এর হয়ে গেলে উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু দু'জন জমির মালিক উচ্চ আদালতে রাস্তা হতে দেবেন না বলে আবেদন করেছেন। যদিও পাতালচণ্ডী উন্নয়ন সমিতি ও প্রশাসন যৌথ ভাবে এই বিরোধিতার যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং পাতালচণ্ডী যে ঐতিহাসিক স্থান এবং রাস্তাটি দীর্ঘদিন থেকেই ব্যবহার হচ্ছিল তার প্রমাণ মানচিত্রসহ উচ্চ আদালতে নথিপত্র জমা দিয়েছে। উল্লেখ্য, এই পাতালচণ্ডী মন্দিরটি বর্তমানে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে ১ কিমি দূরে কাটাগড়ের নিকট অবস্থিত এবং এটি ইংলিশবাজার থানার অন্তর্গত। ডঃ তুষারকান্তি ঘোষের লেখা থেকে জানা যায় যে সেন রাজাদের রাজত্বকালে গৌড়ে ৪টি দ্বারে চারটি চণ্ডীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার অনেক আগে থেকেই গৌড় নগরীর উত্তরে পাতালচণ্ডীর মন্দির ছিল। গৌড়ের সেনরাজারা এই পবিত্র পীঠকেই উত্তর দিকের চণ্ডীর দ্বারে রূপান্তরিত করেন। এছাড়া বিশ শতকের প্রথমে লর্ড কার্জন যখন গৌড় ভ্রমণে আসেন তখন সেই উপলক্ষে গৌড়ের যে মানচিত্র তৈরি হয় তাতেও পাতাল চণ্ডীর দ্বারের উল্লেখ আছে। বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণের সময়ে পাতালচণ্ডী মন্দিরও ধ্বংস হয়। গৌড় পুন্ড্রবর্ধনের অজস্র ভক্ত আজ ধনে সমৃদ্ধ, শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। তাঁরা আজ এই পীঠটিকে নতুন করে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। মালদা জেলার দূর- দূরান্ত থেকে বহু ভক্ত বৈশাখ মাসের শনি ও মঙ্গলবার পাতালচণ্ডী ধামে পূজো দেওয়ার জন্য আজও সমবেত হয়। তাছাড়া বাসন্তী পূজা ও কালী পূজায় এই ধামে ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে দেবীর পূজার্চনার জন্য হাজার হাজার ভক্ত সামিল হন।

শীতকালে পর্যটকরা ঝিল দিয়ে ঘেরা গড়ের ওপর অবস্থিত পাতালচণ্ডী ধামে বনভোজন করতে আসেন। এই রাস্তাটি পাকা রাস্তা হয়ে গেলে পর্যটকরা গৌড়-এর দর্শনীয় স্থানের সাথে পাতালচণ্ডী ধামও সহজেই আসতে পারবেন এবং মনোরম পরিবেশে কাটাতেও পারবেন। জেলার পর্যটন মানচিত্রে ও গাইড বইতে পাতালচণ্ডী ঐতিহাসিক স্থানের নাম থাকলেও খারাপ রাস্তার জন্য পর্যটকরা এখন আসতে পারেন না। সেই দিক থেকে রাস্তাটি পিচের হয়ে গেলে জেলার গুরুত্ব পর্যটকদের কাছে বেড়ে যাবে।

প্রকাশিত হল তৃতীয় সংস্করণ
শ্রী নিত্যরঞ্জন দাস-এর
''মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ''
(৭১২ খ্রীঃ — ১৯৪৭ খ্রীঃ)
প্রথিতযশা মুসলিম, ভারতীয় ও ইওরোপীয়ান ঐতিহাসিকদের তথ্যে সমৃদ্ধ একখানি অসাধারণ গ্রন্থ।
ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক সকলের পক্ষেই উপযোগী।
প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
ফোনঃ ২৩৬০ ৪৩০৬, মোবাইলঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

গহনা যদি গড়াতে চান যে কোনও স্বর্ণকারকে
স্বপ্না
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি -৬

পড়ুন শ্রী হৃদয় রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রণীত

১। জন্মান্তরবাদ (পুনর্জন্ম সম্পর্কীয় গ্রন্থ)	১৫.০০	৬। সমস্যার আবর্তে হিন্দুজাতি ও ভারতবর্ষ	৬.০০
২। ভারত কি খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার পথে?	১০.০০	৭। ধর্মান্তরীকরণ রোধে ভাসের হিন্দুরা	৫.০০
৩। (ছিন্ন) হিন্দু : (খণ্ডিত) ভারত		৮। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য (মাহাত্ম্য সহ)	৫.০০
৪। গর্ভবাসী শিশুহত্যা কী স্বাস্থ্য ও ধর্মসম্মত?	৮.০০	৯। নরকবাস কেন? কোন পাপে? (সুলভ সংস্করণ)	৫.০০
৫। জাতিস্মরের কাহিনি (পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনা সহ)	৭.০০	১০। ভারতে বাজার, অতীতে ও বর্তমানে	৬.০০
		১১। Hindu Majority & India's Integrity	৬.০০

বিঃ দ্রঃ-১ ঃ গ্রন্থ নং ১-ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'যে উপায়ে হোক, আর যে দিক দিয়েই হোক, এই ভারত বিভাগ রদ করতেই হবে।' তাঁহার উক্তিকে মর্যাদা দেওয়ার এখন উপায় - জন্মান্তরবাদভিত্তিক হিন্দুধর্মের অনুকূলে প্রচার চালিয়ে পূর্ববঙ্গ সহ হিমালয়ের এধারের সমস্ত এলাকাকে ধর্মের ভিত্তিতে এক করা, যাহা পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য পূরণের প্রথম পদক্ষেপ। বিঃ দ্রঃ-২ ঃ গ্রন্থ নং ২, ৩, ৬, ৭ ও ১১ — (খণ্ডিত ভারতের জন্য চিন্তান্বিতদের অবশ্য পঠনীয় এবং গ্রন্থ নং-৪ ভ্রূণহত্যার মারাত্মক কুফল, এইডসের মূল কারণ ইত্যাদির বর্ণনা। পুস্তিকা নং ১০-মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে দ্রব্যমূল্য।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বড়ুয়া চৌধুরী অ্যান্ড কোং — ২৬, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
সেন্ট্রাল লাইব্রেরি — ১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্কোয়ার) কলকাতা-৭৩
আশা নিকেতন ৩০/ই, দ্বারিক জঙ্গল রোড, পোঃ ও গ্রাম—ভদ্রকালী, জেলা হুগলি, পিন-৭১২২৩২
(হিন্দমোটর রেলওয়ে স্টেশন থেকে পূর্বদিকে প্রায় ১০ মিনিট হাঁটা পথে)

এই সময়

বাড়-বাড়ন্ত

যত দিন যাচ্ছে, ততই স্পর্ধা বাড়ছে পাকিস্তানের। গত ২৩ মে রবিবারের নিস্তরঙ্গ ছুটির দিনে অকস্মাৎ বিশাল সৈন্য-সামন্ত এমনকী সেইসাথে রকেট ও মর্টার নিয়ে ভারত-সীমান্তে অবস্থিত প্রায় গোটা আটেক সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাল পাকিস্তান। এর মধ্যে পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণঘাঁটি ক্ষেত্রে অবস্থিত সেনা ছাউনিতে হামলা চালালে এক জওয়ান আহত হন। পাকিস্তানের এই 'বাড়'-এর 'বাড়ন্ত' করতে পারেন আমাদের দেশের সেনাবাহিনীই। কিন্তু বাধা নপুংসক কেন্দ্রীয় সরকার।

নিলামে রবিঠাকুর

সুদূর প্রবাসে নিলামে উঠেছেন রবিঠাকুর। মানে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কিছু চিত্রপট। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন গুণীজন। তবে বাজারী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিলাম-কে কেন্দ্র করে 'আনন্দ'-এর পরিবর্তে বিস্তর দুঃখ করা হয়েছে। গুণীজন কিংবা সাধারণ বাঙালীজনের উদ্বেগে কেন্দ্রীয় সরকারের যদিও কিছু যায় আসে না তবে চাপে পড়ে এখন ঢোঁক গিলতে বাধ্য হয়েছে তারা। মনমোহন সিং জানিয়েছেন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের ওই ছবিগুলো কিনে নেবার জন্য যে অনুরোধ করেছে তা বিবেচনা করে দেখা হবে। তবে সেইসঙ্গে গান্ধীজীর 'মেমোরাবিলিয়া' হস্তগত করতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা উল্লেখ করে তিনি এও বলেন— 'চিত্রাঙ্কন-কে তো আইনতভাবে 'অ্যান্টিক' বলা যায় না, তাই এবিষয়ে আইনী দিকটা ভালভাবে খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র।'

প্রথমবার

বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য বাজারে এল ভারত নির্মিত আক্রমণকারী হেলিকপ্টার। প্রায় ৩৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল) নির্মিত ওই হেলিকপ্টারটি গত ২৪ মে প্রথম আকাশে উড়ল। জানা গিয়েছে, যুদ্ধ-বিমানের রোটারী শাখা হিসেবেই আপাতত কাজ করবে এটি, তবে হালকা যুদ্ধের ক্ষেত্রে এই চপারটির ব্যবহার মানানসই।

বাপরে

পরলোক থেকে কি তাঁর দুই পুত্রের ওপর নজর রাখছেন প্রয়াত শিল্পপতি ধীরুভাই আম্বানী? দুই পুত্রের কাণ্ড দেখে তাঁর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাওয়া থেকে আপাতত কিছুদিন রেহাই পেতেই পারে। কারণ গত ২৩ মে দু'টি বিশাল শিল্প সাম্রাজ্যের দুই মালিক তথা দুইভাই রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অনিল আম্বানী এবং এডিএ গোষ্ঠীর মুকেশ আম্বানী আপাতত সমঝোতায় এসেছেন সুপ্রিম কোর্টের চাপেই। এটা শুনে এক দুর্মুখের রসিকতা— দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের চাপে দু'ভাই 'বাপ বাপ' বলে চুক্তি করলেও, স্বর্গ থেকে এটা দেখে 'বাপরে' বলে বোধহয় কঁকিয়ে উঠেছেন ধীরুভাই আম্বানী!

প্রয়াত জন

৮৪ বছর বয়সে গত ২০ মে চলে গেলেন জন শেফার্ড ব্যারন। চিনতে পারলেন না বুঝি? আরে বাবা, ব্যাঙ্কের এ টি এমে টাকা তুলতে যান না নাকি? কি বললেন, বনধ-টনধ কিংবা ছুটির দিনে এ টি এম-ই ভরসা! এত জানেন অথচ এহেন চমৎকার উপকারী জিনিসটার আবিষ্কর্তার নামই জানেন না! আরে, তিনিই তো হলেন জন। চকোলেটের কম্পোনীতে কাজ করতে করতেই চকোলেট বার বেরোনোর মেশিন দেখে এ টি এমের পরিকল্পনা মাথায় আসে তাঁর।

খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি

খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির লাগামছাড়া বৃদ্ধিকে আর কোনওভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না। মে মাসের গোড়ায় এই হার ছিল ১৬.৪৪ শতাংশ। তার পরবর্তী সপ্তাহেই এটা বেড়ে ১৬.৪৯ শতাংশে পৌঁছে যায়। একসপ্তাহে বৃদ্ধি দশমিক পাঁচ শতাংশ, অবশ্য কংগ্রেসী আমলে মানুষের সহ্যশক্তি বিস্তর বেড়েছে। অগ্নিমূল্যের বাজারে গেলেই সেটা দিব্যি টের পাওয়া যায়। লায়লার জলস্ফীতিতে কম্পিত হতে পারে ভারতবাসীর হৃদয়, খাদ্য-মুদ্রাস্ফীতিতে নয়।

মাও-বন্ধু

মাওবাদীদের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন লালুপ্রসাদ যাদব। পাটনায় একটি অনুষ্ঠানে এসে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে লালু সরাসরি তোপ দাগেন মাও-সন্ত্রাস কবলিত ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং-এর বিরুদ্ধে। মাও-দমন নিয়ে রমনকে খোঁটা দিতে গিয়ে লালু মাওবাদীদের পক্ষে সাফাই গান এই বলে—''মাওবাদীরা কিন্তু সাধারণ মানুষকে মোটেই মারছে না।'' 'প্রকৃত বন্ধু'-কে খুঁজে নিতে হয় না, সে আপনিই ধরা দেয়। এই আপ্তবাক্যটাকে বোধহয় ভালভাবেই স্মরণে রেখেছে মাওবাদীরা!

সন্দেহ!

অকুস্থল টাইমস স্কোয়ার। ব্যর্থ জঙ্গি-হানার নতুন ঠিকানা। কিন্তু তা নিয়ে পাকিস্তানের ক্যামোফ্লেজ মোটেই নতুন নয়, বরং বলা যায় নতুন বোতলে পুরনো মদ। যার সাম্প্রতিকতম প্রমাণ হলো ইসলামাবাদ থেকে উপর্যুপরি জঙ্গি সন্দেহে দু'জন-কে গ্রেপ্তার করা। এদেরই মধ্যে একজন হচ্ছে ফৈয়জল সাহাজাদ। যার বিরুদ্ধে ২৬।১১ সহ ভারত বিরোধী চক্রান্তের একাধিক ভালরকম প্রমাণ রয়েছে। একেও 'সন্দেহ' করতে হয়? বলিহারি!

সভ্যতার নাম সংস্কৃত

''সংস্কৃতকে শুধুমাত্র একটি বিশুদ্ধ ভাষা ভাবলে ভুল হবে, এটি একটি সভ্যতা। সংস্কৃত সাহিত্য শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেই ব্যবহৃত হয় না, বরং এর প্রয়োগ একটি সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। আগামী দশ বছরে নিশ্চয়ই পৃথিবী একটা বড় পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবে, কিন্তু মানুষ কি সুখী হবে? কিন্তু সংস্কৃতকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠা সংস্কৃতি শিখিয়েছে, 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ', 'সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'। গত ৭ মে সংস্কৃত পুস্তক মেলায় এসে সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এম এন ভেঙ্কটচালিহা এভাবেই তুলে ধরলেন এমন এক সভ্যতা (সিভিলাইজেশন)-কে যার শেকড়ের নাম সংস্কৃত।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মাওবাদীদের মোকাবিলা

মাওবাদী জঙ্গিদের মোকাবিলা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় অবশ্যই স্মরণে রাখা দরকার। মাওবাদীরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে —প্রচারিত এই তত্ত্বকে কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই যেন আদৌ প্রশ্রয় না দেয়। প্রচারিত তত্ত্বটি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তথা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। সন্ত্রাসবাদীদের মতোই তাহারা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, তাহারা ইদানীং এমন গোরিলা বাহিনী গঠন করিয়াছে যাহারা বিশ্বাস করে—বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। নেপালের মাওবাদীদের মতো তাহারা ক্ষমতা লাভের জন্যই যুদ্ধ করিতেছে। বিশ বছর আগে পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে মাওবাদীদের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন তাহারা অনেক বেশি সংগঠিত, সশস্ত্র, প্রতিবেশী দেশগুলির সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলির সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মাওবাদী সমস্যাকে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কঠিন বিপদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অথচ তিনিই তাঁহার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমকে মাওবাদীদের মোকাবিলায় স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনও সবুজ সংকেত দিতে দ্বিধা-বোধ করিতেছেন। কেননা ইউপিএ সরকারের 'অন্তরাত্মা' কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী মনে করেন, মাওবাদী সমস্যা সমাধানে শক্তি নয়, সংহত উন্নয়নভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়ণই আশু প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস মাওবাদীদের সঙ্গে সাহায্য লইয়া বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছিল। সোনিয়া গান্ধী হয়তো এই জোটেরই পুনরাবৃত্তি চাহিতেছেন এবং এই কারণেই মাওবাদী সমস্যার মোকাবিলায় উন্নয়ণই তাঁহার 'অস্ত্র'। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় মনমোহন সরকার তাই দ্বিধাগ্রস্ত—নরমনীতির অনুসারী। সোনিয়া—একমাত্র সোনিয়া গান্ধীর জন্যই তিনি নিজের বক্তব্যকে কার্যকর করিতে পারিতেছেন না। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তিনি তাঁহার আত্মাকে সোনিয়া গান্ধীর কাছে বন্ধক দিয়া বসিয়া আছেন। আর এই কারণেই মাওবাদীদের মোকাবিলায় সেনা ও বিমানবাহিনী ব্যবহারের স্বাধীনতা চিদাম্বরকে দেওয়া হয় নাই।

আবার কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী বীরাপ্পা মইলি জনস্বার্থ মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে সংযত থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য—বিচার বিভাগের একাংশের অবাস্তববাদী বিচার সংক্রান্ত কাজকর্ম এইদেশে মাওবাদীদের বাড়-বাড়ন্তের অন্যতম কারণ। বিস্ময়ের হইলেও সত্য মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে ইউপিএ সরকার দ্বিধাবিভক্ত। প্রধানমন্ত্রী একরকম ভাবিতেছেন, তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্যরকম বলিতেছেন। আবার আইনমন্ত্রী বিচার বিভাগের দোষ দর্শন করিতেছেন। সরকারের মধ্যেই এই পারস্পরিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মাওবাদীদের আরও সংহত শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। মাওবাদীরা এখন বস্তুত সন্ত্রাসবাদীদের মতোই আচরণ করিতেছে।

এখন তাই সরকারকে সবরকম দ্বিধা-সংকোচ ত্যাগ করিয়া কঠোর হাতে মাওবাদীদের মোকাবিলায় অগ্রসর হইতে হইবে। নাম যাহাই হউক না কেন, সকল হিংসাশ্রয়ী গোষ্ঠীকে প্রথমেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। তাহাদের অর্থ সংগ্রহের উৎসগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে তাহারা যে অত্যাধুনিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা যে কোনও ভাবে বাজেয়াপ্ত কিংবা ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে। তাহাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 'সীল' করিয়া দিতে হইবে। প্রতিবেশী দেশগুলি যেমন—শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, নেপাল এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সহিত তাহারা যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে, অবিলম্বে তাহা ছিন্ন করিতে হইবে। মাওবাদীদের প্রতি যাহারা সহানুভূতিশীল, তাঁহাদের কাজকর্মের উপর বিশেষ নজরদারি রাখিতে হইবে। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করিলেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মাওবাদীরা রেড করিডর গঠনের মাধ্যমে ভারতের মানচিত্রটাই বদলাইয়া দিবার পরিকল্পনা করিয়াছে, এবং এই পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের মতোই আচরণ করিতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাই অবিলম্বে মাওবাদীদের সমূলে উৎখাত করিবার জন্য সরকারকে সর্বপ্রকারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেই হইবে—এখানে কমল-কঠোর, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মানবিকতার কোনও প্রশ্নই নাই।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

জীবনের কোনও লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনও অর্থই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে। সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে। সাধুর কর্মস্থান হইবে। এইখানেই ত্যাগের সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে। এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি মারফত আপনি আপনাকে অঙ্কু রিত পল্লবিত এবং ফলবান করিয়া তুলিবে।...সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণ হইতে বাহির করে। যাহা আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়। যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেওয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আকাঙ্ক্ষাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব; তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনও সংকোচ আমাদিগকে কিছু মাত্র লজ্জাদিতে পারিবে না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থা

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

বাম-শিবিরের এক বড় নেতা জানিয়েছেন যে, আসন্ন পৌর-নির্বাচন কিন্তু রক্তস্নাত হতে পারে।

এটা চলমান রাজনীতির গতি-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিছক একটা আশঙ্কার কথা, নাকি বিরোধীদের প্রতি একটা সগর্ব রণ-হুঙ্কার—সেটা জানি না। কিন্তু প্রশ্ন হলো—নির্বাচনে রক্তপাত কেন হবে? নির্বাচন-ব্যবস্থার সৃষ্টিই তো হয়েছে বুলেটের বদলে ব্যালটকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য। মানুষ শান্তিপূর্ণভাবেই তাঁদের শাসকদের বেছে নিন—এটাই তো গণতন্ত্রের আসল কথা।

অথচ দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক কালের কোনও নির্বাচনই সুষ্ঠু, সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ পথে হয়নি। রক্তপাত, হত্যা, বুথ-দখল, ব্যালট-ছিনতাই, ভোটার তালিকায় কারচুপি, গণনা-বিভ্রাট ইত্যাদির দ্বারা কলুষিত হয়েছে শেষ ভোট-পর্ব। এভাবেই বর্তমানে আমাদের দেশে—বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গে একটা ব্যয়বহুল প্রহসনে পরিণত হয়েছে নির্বাচনের পুরো ব্যাপারটাই।

আসন্ন পুর-ভোটে যে অশান্তি হতে পারে সেই আশঙ্কটা হয়ত হয়েছে মুখ্য নির্বাচন-অফিসার মীরা পাণ্ডেরও। তিনি জানিয়েছেন—রাজের ৮১ টা পুর-নির্বাচনের প্রত্যেক বুথেই থাকবে সশস্ত্র বাহিনী। এই ব্যাপারে এবার কোনও হোমগার্ডকে রাখা হবে না—থাকবে দুজন করে সশস্ত্র রক্ষী। তিনি এই কথা চিঠির মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে জানিয়েছেন। এই চিঠির প্রতিলিপি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র-সচিবকেও।

কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে অবস্থায় পৌঁছেছে, তাতে এই ব্যবস্থার দ্বারা ভোট-দখলের পুরনো ও প্রচলিত ব্যবস্থাকে ঠেকানো যাবে কিনা, সন্দেহ। আর বুথে দুজন সশস্ত্র সৈনিক হয়ত বুথ সামলাবে—কিন্তু আসা-যাওয়ার পথের ধারে ভোটারদের রক্ষা করবে কে? বন্ধ-করা ফ্ল্যাট বাড়ির তালা খোলার কি হবে?

ডঃ হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নির্বাচনের স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছতার ওপরেই—'The success of democracy depends upon free and fair election—(ইন্ডিয়া ঃ ডেমোক্র্যাটিক গর্ভনমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স, পৃঃ ৩৩৪)। ডঃ সুভাষ কাশ্যপের মতে, আমাদের দেশে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারটাই স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব—'the biggest revolutio' —(আওয়ার কন্‌স্টিটিউশন, পৃঃ ২৫৪)। কিন্তু সেই ভোটাধিকার যদি স্বাধীনভাবে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোগ না করা যায়, তাহলে তার কোনও অর্থই থাকে না।

এইসব কথা সংবিধান রচয়িতাদেরও মনে এসেছিল। এই কারণে তাঁরা নির্বাচনের ব্যাপারটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তার জন্য সংবিধানকে একটা পৃথক অধ্যায় যুক্ত করেছেন। এটা অন্যত্র কিন্তু দেখা যায় না। তাছাড়া আমাদের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও বিধানসভাগুলোর নির্বাচন পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও নিষ্পন্ন করার জন্য রাখা হয়েছে একটা নির্বাচন কমিশন। বলা বাহুল্য, এটা একটা স্বাধীন ও পৃথক সংস্থা—ডঃ এম. ভি. পাইলীর ভাষায়, 'The Commission is an independent body'—(অ্যান্ ইন্ট্রোডাক্শান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ২৭৪)। এই সংস্থার ওপর রাজনীতির প্রভাব যাতে না পড়ে, তার জন্য কিছু ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

কিন্তু স্পষ্ট করে বলাই ভাল—নির্বাচনে অশান্তি, দুর্নীতি, অন্যায় ইত্যাদি আদৌ রোধ করা যায়নি। তার কারণ হলো—নির্বাচনটা এখন শুধু ক্ষমতা দখল করা বা ধরে রাখার একটা রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তার ফলে বিভিন্ন দল জনমতের ওপর নির্ভর না করে ভোট-দখলকেই রাজনীতির মূলমন্ত্র করে ফেলেছে। তার শুরু ভোটার তালিকা তৈরি থেকে এবং শেষ ভোট গণনা দিয়ে। মাঝখানে রয়েছে বুথ-দখল, হাঙ্গামা, ভীতি-প্রদর্শন, ব্যালট ছিন্‌তাই, ভোটারদের লাইন-ভাঙা, ভোট কর্মীদের ওপর চাপসৃষ্টি ইত্যাদি।

ডঃ অনুপচাঁদ কাপুর এই ব্যাপারে বিহার, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর ইত্যাদি রাজ্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, capturing of polling booths has now become a routine process by organised and armed gangs of hodlums।' তিনি আরও লিখেছেন, এই ব্যাপারে ডাকাতদের ব্যবহার করা হয়—(দ্য ইন্ডিয়ান পলিটক্যাল সিস্টেম, পৃঃ ৪২৫)। ডঃ এস. এল. সিক্রিও মনে করেন, ভোটার-তালিকা তৈরি, ভোট-গ্রহণ ইত্যাদির ব্যাপারে নানা ধরনের জাল-ভেজাল থাকে—এই কারণে জীবিতদের অনেকে ভোট দিতে পারেন না, কিন্তু মৃতরাও কাজটা করে থাকেন—'Thousands of voters long dead and countless of others who never lived, vote regularly'—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ১০১)।

উল্লেখ করা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গের বাম-সরকার এটাকে এক সূক্ষ্ম শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। ভোটার-তালিকা তৈরি, বুথে ভোট-কর্মী নিয়োগ, ব্যালট-গণনা প্রভৃতি কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ কর্মীর দরকার। এই কারণে সংবিধানের ৩৪২ (৬) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—নির্বাচন-কমিশন তার জন্য রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের কাছ থেকে সরকারি কর্মচারীদের চেয়ে নিতে পারে। সেই সুযোগটাকেই এই ধরনের সরকার দলীয় স্বার্থে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে। শাসকদলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন অনুগত সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। এক প্রাক্তন পর্যবেক্ষক আফজল আমানুল্লা জানিয়েছিলেন—কিভাবে সংগঠনের মাধ্যমে শাসক-দলের স্থানীয় অফিসে বিভিন্ন বুথের ভোট-কর্মীদের নামধাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর শুরু হলো প্রভাবিত করা বা প্রলুব্ধ করা বা ভীতি-সঞ্চারের কুৎসিত কাজগুলো। অনেক ক্ষেত্রে পোলিং-কর্মীরা বাধ্য হয়ে ভোট প্রহসনের সেই প্রহসন দেখেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার মূর্ছা যান বা পালিয়ে বাঁচেন।

দু-একজন ক্ষীণকায় লাঠিধারী পুলিশ হয়ত বুথের বাইরে থাকে, কারও কারও হাতে বন্দুকও থাকে—কিন্তু তা থেকে গুলি বেরোয় না। আর গুলি বেরোলেও সেগুলো শাসকদলের ক্যাডারদের দিকে ছোঁড়া বারণ, কারণ প্রভুদের অসন্তুষ্ট করা চলবে না। ডঃ বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, পুলিশের পক্ষে কর্তব্যপালন করা সম্ভব যদি শাসকরা তাদের দলদাসে পরিণত না করে—'It is only possible if the Government dose not prostitute the police-machinery to gain its ends'—(পুলিশ-অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশান ইন্ ওয়েস্ট- বেঙ্গল, পৃঃ ১৫১) কিন্তু মার্ক্সবাদী-শাসনে সেটা কল্পনাই করা যায় না। বিতর্কিত পুলিশ-অফিসার নজরুল ইস্‌লাম আগেই দেখিয়েছিলেন—এই নেতারা কিভাবে পুলিশকে নির্বাচনের সময় দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে।

কিন্তু এই নারকীয়তা চলছে নির্বাচন-কমিশনের কর্তৃপক্ষের সময়ই। মুখ্য নির্বাচন -কমিশনার হয়েই টি. এন. শোষণ পর্যবেক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছিলেন। অথচ এক মন্ত্রী দলীয় স্বার্থে পর্যবেক্ষককে বিশ্রী গালাগালাজ করেও পার পেয়ে গেছেন—থানায় ডায়েরী করেও কোনও লাভ হয়নি।

কিন্তু এগুলো লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনের কলঙ্কিত কথা। পঞ্চায়েত, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন-কাহিনী আরও কদর্য, কারণ ৩২৪(১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে এগুলোর নির্বাচন কিন্তু নির্বাচন-কমিশন পরিচালনা করে না—এই দায়িত্বটা রাজ্যের নির্বাচন-দপ্তরের। সুতরাং এক্ষেত্রেই প্রহসনটা কুনাট্যে পরিণত হয়।

সরকারের কাজ শাসন করা—তার হাতে নির্বাচনের দায়িত্ব কেমন করে দেওয়া যায়, সেটা আমরা বুঝি না। এর জন্য রাজ্য-সরকারের একটা নির্বাচন-দপ্তর রয়েছে, রয়েছেন নির্বাচন অফিসার। ডঃ বি. সি. রাউত মন্তব্য করেছেন—'The Chief Electoral Officer is generally appointed from the senior Administrative

(এরপর ৪ পাতায়)

> **"আমরা মনে করি—এই অসহনীয় ও অগণতান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেই হবে, তা না হলে সেটা হবে অগণিত মানুষের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা। সেই কাঙ্ক্ষিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য দরকার নির্বাচন-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ঘটানো।"**

দলতন্ত্রের হীন খপ্পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(১ পাতার পর)

আজকের পরিষৎ-নেতৃত্ব অনায়াসে সে কথা কবুল করছেন।

কেন এমন অবস্থা হলো? এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে। পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার—দলতন্ত্রের হাঙ্গর-গ্রাসে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেভাবে গিলে খেয়েছে ঠিক সেভাবেই গিলতে চেয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-কে। সে কাজে নানা সময়ে দলদাস অমেরুদণ্ডী মানুষ পেতে তাদের দেরি হয়নি। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মূল কার্যধারা যেহেতু প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য আর পুঁথি-পত্রে নিবদ্ধ, তাই তেমন 'বিশেষজ্ঞ' পাওয়া কঠিন হয়েছে। আশ্বিন ১৩৯১ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিয়মাবলী'তে আছে 'প্রাচীন বাংলা পুঁথি ও অন্যান্য গ্রন্থাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ' করা, 'প্রত্নবস্তু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তৎসম্বন্ধীয় গবেষণা ও তাহার ফল প্রকাশ' করা পরিষৎ-এর উদ্দেশ্য। এসব কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ আছে। একজন 'বিশেষজ্ঞ'-কে জানি, তাঁর নামে প্রকাশিত পুঁথি সংক্রান্ত একটি বই-এর মান নিচু বললেও কম বলা হয়। পরিষৎ-এর এক কর্তা তাঁর শ্বশুরের কৃপায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদে চাকরি পেয়েছেন। তিনি মধ্যযুগ বিশেষজ্ঞ বলে চাকরিটি পেয়েছেন—ওইরকম 'বিশেষজ্ঞ'দের কৃপাধন্য হবার সুবাদে—পুঁথিপত্র নাড়তে চাড়তে জানেন না। এক কর্তা বর্তমান প্রতিবেদকের সামনে এক সাংবাদিককে শিলালেখ সম্পর্কে, তাম্রশাসন সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ মধ্যস্তরের ছাত্ররাও বলবে না! প্রত্নবস্তু খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না। ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী তখন পাচার হয়ে যাওয়া একটি মূর্তি বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। জানি না, এখনকার অবস্থা কি! কোনও স্টক-রেজিস্টার নেই, রাখার কথা কেউ ভাবেনও না। উপরন্তু, বাংলার নানা অঞ্চলের মাটির তৈজসপত্র, পুতুল এনে প্রদর্শশালা সাজানো হচ্ছে। খরচ হচ্ছে লক্ষ কোটি টাকা। প্রতি বছর হিসাব-বহির্ভূত বহু খরচপত্রের কথা উল্লেখ করে—'কর্তৃপক্ষ দ্বারা শংসীকৃত' কিন্তু 'আমাদের দ্বারা পরীক্ষিত নয়'—এরকম মন্তব্যসহ হিসাব পেশ হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য পাশে সরিয়ে—বিকৃত করে, অবৈধ কার্যকলাপ চলছে। সরকার দেখেও দেখছে না।

১৯৮৬ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' গড়লেন সরকার। ১৯৯৪ নাগাদ স্বশাসিত সংস্থায় পরিণত হলো আকাদেমি। উদ্দেশ্য নাকি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবহমান ধারা বজায় রাখা ও তার উন্নতি বিধান। উন্নতি বিধানই বটে! কিন্তু কার? একটি উদাহরণ দেব। পবিত্র সরকার আকাদেমির বানানবিধি প্রণয়ন করলেন। পরমুহূর্তে প্রকাশকরা পেলেন সরকারী ফরমান—এই বানান বিধি না মানলে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তককে অনুমোদন দেবেন না মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ! বাধ্য হয়ে বানান-বিধি মানলেন পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা। এমনিতে এই উদ্ভট বানান-বিধি মানা যায় না। বানান আর লিপি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাই নেই ওই বানান-বিধিতে। তাতে কি, বানানের নতুন নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে চেপে বসল 'আকাদেমি'-র যুক্তাক্ষরের বিচিত্র আকার—যা কোনও ভাবেই বানান সংস্কারের এক্তিয়ারে পড়ে না! আকাদেমি বানান বিধিতে পাঠ্য পুস্তক ছাপানো চলল—ছাপাখানা, প্রুফ সংশোধকরাও সামান্য লক্ষ্মীলাভ করলেন। আকাদেমির 'বানানবিধি'-র বিক্রি বাড়ল—নানা সংস্করণ হলো, তাতে কোনও ঐক্য থাকল না—ফলে গোলযোগও বাড়ল। বানানবিধির আবিষ্কারকের লক্ষ্মীলাভ কত হলো তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বাংলা ভাষা সাহিত্যের পুরোনো বইপত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হলো আমাদের পড়ুয়াদের প্রজন্ম। তারা যেসব যুক্তাক্ষর শিখল তা তো আর পুরোনো বইপত্রে নেই! ফল সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শতবর্ষ পরেও সদর্থক কাজ করে যাবে। 'নব বঙ্গ সাহিত্য অদ্য প্রায় একশত বৎসর হইল জন্মলাভ করিয়াছে;আর একশত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয়, তবে সেই উৎসবসভায় যে সৌভাগ্যশালী বক্তা বঙ্গ সাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন'—তাকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি জানতেন না বাংলা এখন কোন সভ্যতার আবর্জনাদের শাসনাধীন থাকবে। জানতেন না বাংলা আকাদেমির ষড়যন্ত্রীদের নষ্টামির কথা। ১৯৯৪ সালে শতবর্ষের উৎসব সূচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর যাবতীয় প্রত্নবস্তু, পুঁথিপত্র 'নন্দন' চত্বরে নিয়ে যাবার উদ্যোগের কথা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। কি করে তিনি বিভিন্ন সংগঠন দখল করার রক্তিম-বিভীষিকার সংবাদ জানবেন! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কিছু অনুরাগী, উত্তর কলকাতার কিছু দরদী ঐতিহ্য-সচেতন মানুষ সেদিন দুঃসংবাদটি পাবার পর রুখে দাঁড়ান। আইন মেনে শেষ পর্যন্ত গর্হিত কাজটি স্টালিনপন্থী রাজনীতিকরা করতে পারেননি। যদি পারতেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বাড়িটিতে ভূতের কীর্তন শুনতে বা প্রমোটার-নর্তন দেখতে পেতাম আমরা।

ওই সময় যোজনা কমিশনের সহ সভাপতি ছিলেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী মাননীয় প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছে দরবার করলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কিছু শুভানুধ্যায়ী মানুষ। প্রণববাবু দিল্লীর 'বঙ্গ ভবনে' গেলেনই না। শোনা গেল ট্রেন ফেল করেছেন! গুজব—প্রণববাবুর হাত থেকে টাকা নিতে পছন্দ করেননি আগমার্কা বিপ্লবীরা। প্রণব মুখোপাধ্যায় চেকটি রাজ্যসরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তারপরের ঘটনা রোমাঞ্চকর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-কে অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করলেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। বাকি টাকা বরাদ্দ হলো 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র জন্য। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি টাকার জন্য আবেদন করেনি, তারা শতবর্ষের প্রাচীন সংস্থা নয়। কিন্তু তবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-কে বঞ্চিত করল সরকার। আর আশ্চর্যের কথা, পরিষৎ থেকে এ নিয়ে কোনও প্রতিবাদ হলো না। উপরন্তু একটি বিচিত্র সংগঠন ('পাঠক সমাজ') গড়ে পরিষৎ-এর কোনও কোনও কর্তা বাংলা আকাদেমির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠান করতে থাকলেন। দিনের পর দিন ওই 'পাঠক সমাজ' হয়ে পড়ল পরিষৎ-এর প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। লেনিন-এর একটি ছোট বই আছে—'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'। সমাজবাদ বিকশিত হলে রাষ্ট্র নাকি শুকিয়ে মরবে। লেনিন এরকম ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন। তেমন সমাজবাদ কোথাও দেখা যায়নি। সর্বত্র সেনাবাহিনী, পুলিশ আর পার্টির ভয়ঙ্কর শাসনে রাষ্ট্র হয়েছে একমাত্র নিয়ন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র বা দল নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠানের চাপে শতাধিক বর্ষের ঐতিহ্যমূলক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-কে শুকিয়ে মারার লেনিনীয় (?) কর্মসূচী পালন করা হতে থাকল। ন্যায় নীতি যুক্তির কোনও ধার ধারল না দলতন্ত্র।

বাংলার প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা এরকম অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন তাই স্বাভাবিক। সংখ্যায় বেশি না হলেও আত্মমর্যাদা ও যোগ্যতায় অত্যন্ত পারঙ্গম তাঁরা। গড়ে উঠেছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রক্ষা সমিতি'। সভাপতি অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়; কার্যকরী সভাপতি বর্তমান লেখক। এই নতুন সংগঠনটি বাংলার শিক্ষিত মানুষদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে কলুষ মুক্ত করতে—দলতন্ত্রের কবল থেকে বের করতে সমবেত লড়াইতে নামার জন্য তৈরি হোন। গত ২২ ফাল্গুন ১৪১৬ বঙ্গাব্দে ছিল পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা। এর আগে কোনওদিন যা হয়নি এবার তাই ঘটল। পুলিশ ডেকে আনলেন পরিষৎ-এর বর্তমান কর্মকর্তারা। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রক্ষা সমিতি'-র কেউ পরিষৎ-মন্দিরে গুণ্ডামি করতে যাননি। তাহলে কিসের ভয়ে পুলিশ ডাকতে হলো? রবীন্দ্রনাথ-হরপ্রসাদ-রামেন্দ্রসুন্দরের পদধূলিতে পবিত্র সাহিত্য পরিষৎ-কে কলুষিত করলেন যারা তাদের জন্য কোনও ধিক্কারই যথেষ্ট নয়। বাংলার মানুষ একথা যেদিন জানবেন—আর সেদিন তারা এইসব ভ্রষ্ট-নষ্ট-ভণ্ডদের ক্ষমা করবেন কি? নিশ্চয়ই নয়। এবছরের সম্পাদকের প্রতিবেদনে মিলল একটি ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। 'গত পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় এই প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নবীকরণ হয়নি।' আইন মোতাবেক সময় মতো প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নবীকরণ করা না হলে রেজিস্ট্রার প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহি করবেন;পরপর তিন বছর নবীকরণ না হলে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল হয়ে যাবে। প্রশ্ন উঠতেই পারে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' কি আদৌ বেঁচে আছে? অন্যদিকে বছরের পর বছর নবীকরণ না পেলেও দলবাজ ধড়িবাজদের দল কিভাবে পাচ্ছেন সরকারী অনুদান? পরিষৎ-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে গেলে—কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় বর্তমান কর্তৃপক্ষের আছে কিনা সন্দেহ। কেন্দ্র সরকারের কোনও কোনও দপ্তর হিসাবপত্র না পেয়ে কালো তালিকাভুক্ত করার হুমকি দিয়েছেন পরিষৎ-কে। সম্পাদকের প্রতিবেদনে তা ছাপা হয়েছে। অযোগ্যতা আর অক্ষমতা প্রদর্শনের অসীম সাহসের বলিহারি যাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-কে খুন করে আততায়ীরা হাসছেন—বনে যাচ্ছে পরিচালক।

এবছর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রক্ষা সমিতি'র পক্ষ থেকে ২০ জন কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হবার জন্য আমরা প্রার্থী ছিলাম। ভোটার তালিকা আমাদের দেওয়া হয়নি। অথচ পরিষৎ-এর 'নিয়মাবলী'র ১৩-চ ধারাতে আছে—'যে কোনও সদস্য' 'ভোটারের তালিকা নকল করিয়া লইতে পারিবেন'। বারবার অনুরোধ করেও সেই কাজ আমরা করতে ব্যর্থ হয়েছি। ভোটার তালিকায় আছে অজস্র মৃত সদস্যদের নাম। বহু সদস্য ঠিকানা বদলেছেন। এ বিষয়ে আমাদের কাছে আছে বেশ কিছু প্রমাণ। ভোটের আগে পরিষৎ-এর অর্থে কয়েকটি গাড়ি ভাড়া করে সদস্যদের কাছে গিয়েছেন ভোট-জালিয়াতরা। তারা সদস্যদের কাছে ব্যালট নিয়ে এসে ইচ্ছামতো দাগা বুলিয়ে ব্যালট বাক্স পূরণ করেছেন। প্রায় বারোশ' সদস্যের পরিষৎ-এ তিনশো কি সাড়ে তিনশো-টি ভোট পত্র জমা হয়। অর্থাৎ আটশোর উপরে সদস্যরা হয় ভোটপত্র পাননি—নাহয় হাজার বারোশ ভোট জালিয়াতরা কোনওভাবে কবজা করেছেন। কবজার বহুমুখী পদ্ধতি। সেসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না। মোট কথা, দুর্নীতিগ্রস্ত অপরাধীরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরকে কলুষিত করছেন। এদের কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় দেবার সময় এসেছে। বাংলার শিক্ষিত মানুষরা এগিয়ে আসুন।

গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থা

(৩ পাতার পর)

Services'—(ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ২০৩)। তিনি কিন্তু রাজ্য-সরকারের কর্মী—পদোন্নতি, পোস্টিং ইত্যাদির জন্য মন্ত্রীদের সন্তুষ্ট করে চলার প্রকৃতি তাঁর থাকতেই পারে। ডঃ কে. ভি. রাও লিখেছেন, 'He is one of the local I.A.S. Officers who is not beyond the favours of the Executive of the State-Government'—(পার্লামেন্টারী ডেমোক্র্যাসী ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ১০২)। পরে এই ধরনের অফিসার স্বরাষ্ট্রসচিব বা ওই ধরনের কোনও উচ্চতর পদে উন্নীতও হয়েছেন। তাঁদের সততা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নও উঠেছিল বারবার—কারণ কোনও অভিযোগ উঠলেই তাঁরা বলতেন —'আমি তো শুনিনি' বা 'কেউ তো আমায় বলেনি।'

এই অবস্থায় একটা সুষ্ঠু, সুস্থ ও ন্যায়সম্মত নির্বাচন হতে পারে? এই কারণেই আমরা সংবাদপত্রের ফটোতে দেখেছি পৌর-নির্বাচনে একদল ক্যাডার বোমা ফাটাচ্ছে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে এক পুলিশ-অফিসার মুগ্ধ চোখে সেটা দেখছে।

আমরা মনে করি—এই অসহনীয় ও অগণতান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেই হবে, তা না হলে সেটা হবে অগণিত মানুষের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা। সেই কাঙ্ক্ষিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য দরকার নির্বাচন-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ঘটানো।

প্রথমত, ৩২৪(১) নং অনুচ্ছেদের সংশোধন ঘটিয়ে পৌর-নির্বাচনকেও নির্বাচন-কমিশনের অধীনে আসতে হবে। অর্থাৎ রাজ্য-সরকারের হাতে নির্বাচনের কোনও দায়িত্বই রাখা চলবে না।

দ্বিতীয়ত, এর ফলে নির্বাচন-কমিশনের কাজের চাপ বাড়বে ঠিকই, কিন্তু ৩২৪(৫) নং অনুচ্ছেদ আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারের কথা বললেও আজও এই ধরনের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের রাজ্যগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে এক-একজন আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারের অধীনে আনলে ও পৃথক অফিস তৈরি করলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাজ অনেকটা হাল্কা হতে পারে।

তৃতীয়ত, রাজ্যের নির্বাচন-দপ্তরকে আনতে হবে প্রত্যক্ষভাবে আঞ্চলিক কমিশন ও পরোক্ষভাবে মূল নির্বাচন-কমিশনের অধীনে। রাজ্যের নির্বাচন-অফিসারের সঙ্গে রাজ্য-সরকারের কোনও সম্পর্কই থাকবে না—তাঁরা পুরোপুরি নির্বাচন-কমিশনের অধীনে কাজ করবেন। —তাঁদের নিয়োগ, পদোন্নতি, শাস্তিব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে কমিশনের হাতে।

চতুর্থত, নির্বাচন-কর্মীদের নিরপেক্ষতা ও সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলেই কমিশন তার তদন্ত করবে এবং প্রয়োজনে কঠোর শাস্তি দেবে।

পঞ্চম মত, প্রয়োজনে কমিশন সেনা ও আধা-সেনাবাহিনীর সাহায্য নেবে—রাজ্যের পুলিশ তাদের সাহায্য করবে মাত্র।

ষষ্ঠত, পর্যবেক্ষকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে সুযোগ দিতে হবে। মন্ত্রী-নেতারা তাঁদের কাজে বাধা দিলে বা অন্যান্য সমালোচনা করলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সব শেষে বলা যায়—জাল ভোট, বুথ দখল ইত্যাদির ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ডদানের জন্য আইন বদলাতে হবে।

এই ধরনের পরিবর্তন যদি আনা যায়, তাহলে নির্বাচনটা হয়ে উঠবে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ। সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যই রাজনৈতিক দলগুলোর এই স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থবোধকে অবিলম্বে প্রতিহত করা দরকার।

ডঃ জে. সি. জোহারী মনে করেন, সংবিধান রচয়িতারা সুষ্ঠু ভোট-ব্যবস্থা ও নাগরিকদের ভোটাধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ৭৯৫)। কিন্তু রাজনীতির পঙ্কিলতা সেই গণতন্ত্রের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এটা কিন্তু চলতে পারে না।

মন্টেককে মোদীর মোক্ষম জবাব

(১ পাতার পর)

করার কথা বলেছিলেন আলুওয়ালিয়া। একই সঙ্গে ডাংস এলাকার জনজাতিদেরও বিদ্যালয়ের আঙিনায় নিয়ে আসতে বলেন তিনি।

প্রশ্ন উঠছে—যেখানে মহল্লাতে স্কুল রয়েছে, অথচ অভিভাবকদের ও সমাজপতিদের তাগিদ নেই স্কুলে পাঠানোর, সেক্ষেত্রে মোদী কী করতে পারেন। আবার, সমালোচনাও তাকে শুনতে হচ্ছে। অথচ, সাচার কমিটির রিপোর্টে দেশের মধ্যে গুজরাটেই মুসলমানদের অবস্থা ভালো বলে বলা হয়েছে। ওই কমিটিও বর্তমান কেন্দ্র সরকারই নিয়োগ করেছিল।

নীতিগতভাবে ভারত সরকারের সদিচ্ছা হলো জাত-পাত-ধর্মমত নির্বিশেষ ভারতের প্রতিটি ছেলেমেয়েই স্কুলে লেখাপড়ার জন্য সামিল হোক।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আলুওয়ালিয়া শুধুমাত্র মোদীকে পত্র লিখতে গেলেন কেন? নয়াদিল্লীর যোজনা ভবনে ২০১১-২০১২ আর্থিক বর্ষে যোজনা বরাদ্দের বৈঠকে ১৮ মে লেখা চিঠির বিষয়ে কৈফিয়ৎ তলব করাটা কি অসৌজন্যমূলক নয়? বিশেষত, মোদীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে গুজরাটে আর্থিক উন্নতির রেখাটা যেখানে বরাবরই উর্ধমুখী। তাই আলুওয়ালিয়াদের মোদীকে মুসলমান বিরোধী হিসেবে প্রতিপন্ন করাটা নিতান্তই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম গৌরবজনক পরাজয়ের জন্য ছুটে চলেছে

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতির অঙ্গনে যাবার আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাওবাদী আক্রমণে যেসব জওয়ান সাধারণ মানুষ, যাত্রী নিহত হচ্ছেন, হয়েছেন তাঁদের প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। একাধিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নিরাপত্তারক্ষীদের, যৌথ-বাহিনীর আলগা মনোভাবের দরুণ হত্যালীলা সংগঠিত করতে সক্ষম হচ্ছে মাওবাদীরা। মাওবাদীরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম-এর শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। অথচ কলকাতার এক বাংলা দৈনিকে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, ''মাওবাদীদের সঙ্গে চিদম্বরম শান্তি আলোচনায় বসুক।'' মাওবাদীরা রেললাইন উড়িয়ে দিচ্ছে। রেলমন্ত্রী নিন্দা করছেন না কেন? এ-রাজ্যে মাওবাদীদের বৃদ্ধির কারণ বুদ্ধ দেববাবুরা, তাঁরা নাকি রাজনৈতিকভাবে মাওবাদীদের মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। যে কাজ করার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা বুদ্ধ বাবুদের নেই। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির আমল থেকেই পার্টির একাংশের মধ্যে চীনা-প্রীতি ছিল। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা ''স্বাধীনতা''-এর জন্য চীন থেকেই মেশিন এসেছিল—প্রায় বিনা পয়সায়। তারপর পার্টি ভাগ হওয়ার সময়ে চীনের পার্টির তত্ত্বগত ৯টি পুস্তিকা আজকের সিপিএম-এর নেতাদের কাছে বেদবাক্য ছিল। এসব কারণেই মাওবাদী তৈরি হবার রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। আর বর্তমানে তিনদশকের বেশি রাজত্ব করার পরও জনজাতিদের উন্নয়নের এবং আঞ্চলিক কুটিরশিল্প গড়ার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে এইসব হতদরিদ্র অভুক্তরা মাওবাদীদের মনমোহিনী কথায় উৎসাহিত হয়ে মাওবাদীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এর উপর যদি বিরাটসংখ্যক বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হয় তবে মাওবাদীরা আরও ''সৈন্য'' পাবে। এমনকী সিপিএম দলের বেকার যুবকরাও এই দলে যাবেন।

এর উপর আছে প্রশাসনিক স্তরে মাওবাদীদের কর্মপন্থা, তত্ত্ব সম্পর্কে এক অজ্ঞতা। মাওবাদীরা পমেরজের গেরিলা যুদ্ধের লেখা অনুসরণ করছে। গোয়েন্দা-বিভাগ এই বইটি পড়ুন। একদা এটি সিপিএম অনুবাদ করেছিল। তখন তদানীন্তন পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়ার পার্টিজান ওয়ারফেয়ার-এর তত্ত্ব প্রচার করতেন। তার ফল ফলেছে—বলা উচিত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সমেত ফিরে এসেছে। এখন কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব ধনিকশ্রেণীর নীতির রক্ষক-পোষক হয়েছেন। বিশেষত পার্টির ওপরতলার নেতারা যখন বিলাস-ব্যসনে থাকছেন তখন নিচের তলার কর্মীদের কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ফলে নিচের তলার কর্মীরা পার্টিনেতাদের আর মানতে চাইছেন না।

পৌর নির্বাচনের প্রচারে নানা ঘটনা ঘটছে। রিজওয়ান কাণ্ড নিয়ে মুসলিম তাস খেলছেন মমতা এবং সিপিএম!! তৃণমূল কংগ্রেসতো বিধানসভার নির্বাচনে জেতার জন্য পৌরনির্বাচনে জয় চাইছে। তৃণমূলের প্রচারে আছে—''কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতক, তৃণমূলের সহায়তায় বিগত লোকসভা নির্বাচনে সাফল্য পেয়েছিল।'' প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, দুই-একটি ক্ষেত্রে কংগ্রেস ভোট কাটার দরুণ তৃণমূলের প্রার্থীর পরাজয় হতে পারে। মধ্য কলকাতা এবং উত্তর কলকাতায় কংগ্রেস তৃণমূলের জয়ের প্রতিবন্ধক হতে পারে। কলকাতা পুরসভায় বিজেপি—একের বেশি আসন পেতে পারেন—যদি নির্বাচনের দিন সংগঠনটা ঠিকঠাক রাখতে পারেন। উত্তর কলকাতায় অভিনব লড়াই হচ্ছে। সিপিএম-এর সুধাংশু শীলের সঙ্গে তৃণমূলের পরাজিত বিধায়ক তাপস রায়ের। তাপস রায় মধ্য কলকাতার ৪৮ নং ওয়ার্ডের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বাসিন্দা। এককথায় বড়বাজার থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন। এই ওয়ার্ডে নির্বাচনের দিন প্রচণ্ড হাঙ্গামার সম্ভাবনা আছে।

কংগ্রেস প্রচার করছে তৃণমূলের একগুঁয়েমির জন্য সার্বিক ঐক্য হলো না। এখানে বলা দরকার বিজেপি সমেত ঐক্যকে সার্বিক বলা যেতে পারে।

> “সিপিএম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই সঙ্গীন। পশ্চিমবঙ্গের পলিটব্যুরো সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগই কংগ্রেস-এর সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলার পক্ষে। একমাত্র নিরুপম সেনই প্রকাশ কারাতের সঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধী লাইনের সমর্থক।”

সিপিএম এখন আদাজল খেয়ে নিজেদের গৌরবজনক পরাজয়ের জন্য ছুটে চলেছে। বুদ্ধ বাবু বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁর বাণী শুনিয়েছেন। আগের থেকে তিনি এখন একেবারেই নরম, স্তিমিত।

আর এস পি তাঁদের বিতর্কিত নেতা-মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীকে দিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে সিপিএম-এর পক্ষে বক্তব্য রাখিয়েছে। তথাপি আর এস পি-এর সমর্থকরা সিপিএম-এর বিরুদ্ধেই ভোট দেবেন। বিশেষ করে পূর্ব কলকাতায়—মাখন পালের মানসপুত্র খেলা দেখবেন।

কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী এবং দীপা দাসমুনসি-এর কাজকর্ম দেখে মনে হয়—''একা কুম্ভ রক্ষা করেন নকল বুঁদিগড়।''

এখানে একটা কথা বলা যেতে পারে। মমতা বিধানসভা নির্বাচন যে এগোতে চাইছেন তার একটা কারণ—পৌর-নির্বাচনের ফলাফলের জয়ের পটভূমিতে বিধানসভার জয়ের জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টি। আর সিপিএম বিরোধিতা করছে এর বিপরীত কারণে। তারা চাইছে পৌর-নির্বাচনের পরাজয়ের রেশ স্তিমিত হলে বিধানসভা নির্বাচনে যাওয়াই অনুকূল হবে।

এদিকে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ কংগ্রেস-তৃণমূল ঐক্য না-হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক পৌরনির্বাচনের পর বামফ্রন্ট ছেড়ে চলে যেতে পারে। কারণ এই দল মমতাকে অনেক বেশি পছন্দ করে। একসময়ে অশোক ঘোষ মমতাকে ''নেত্রী'' বলে মেনে নিয়েছিলেন। বারংবার মমতার সঙ্গে অশোক ঘোষ সভা করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ''বুদ্ধ বাবু অন্যায়-অবিচার করছেন। আর সিপিএম হলো লুম্পেনদের পার্টি।'' পৌর নির্বাচনের আগে এবং পরে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের বহু কর্মী ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে চলে যাবেন। স্মরণ করা যায় ১৯৭১ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক সিপিএম-এর বিরোধিতা করে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য করেছিল।

কাজেই যে কথা আগেই বলা হয়েছে সেটা আবারও বলছি—পৌরনির্বাচনের পর সিপিএম-কে ছেড়ে একাধিক বামশরিক দল চলে যাবে। আর এস পি নকশাল গোষ্ঠীদের সঙ্গে ''বৃহত্তর বামঐক্য'' গড়ে তুলবে।

সিপিএম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই সঙ্গীন। পশ্চিমবঙ্গের পলিটব্যুরো সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগই কংগ্রেস-এর সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলার পক্ষে। একমাত্র নিরুপম সেনই প্রকাশ কারাতের সঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধী লাইনের সমর্থক।

বুদ্ধ বাবু যে শিল্পনীতি বোঝেন না—সেটা নিরুপম সেন জানিয়েছেন। তিনি বহু উদাহরণ দিয়েছেন—যেমন, বুদ্ধ দেববাবু রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা-কে নিয়ে জাপান সফরে গেলেন। সেখানে জাইকোর অর্থাৎ জাপানিজ অ্যাসিস্ট্যান্স ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন সঙ্গে 'মউ' স্বাক্ষরিত করে বারাসাত রায়চক এক্সপ্রেস এবং রায়চক-কুকড়াহাটি সেতু-নির্মাণের ব্যবস্থা হলো। এর এক বছরের মধ্যেই জাইকোর ইঞ্জিনীয়ারা কাজে এগোলেন। এরপরে

(এরপর ১৫ পাতায়)

অন্য রকম

জেসিকা ওয়াটসন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মেয়েটার বয়স ১৬ বছর ৩৬২ দিন। এটা অবশ্য এবছরের ১৫ মে-র হিসেবে। ইতিমধ্যেই সেই বয়স নিঃসন্দেহে ১৭ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, লোকে তো জন্মদিনটাকেই

জেসিকা ওয়াটসন

স্মরণে রাখে। মানে ৩৬২ দিনের সঙ্গে ৩ যোগ করলেই তো তার ১৭ বছর পূর্ণ হোত। দিনাঙ্কও তিন দিন বেড়ে ১৮ মে হতেই পারতো। খামোকা শুধু শুধু দিন-তিনেক আগে সেই বেখাপ্পা বয়সটার কথা এত ঘটা করে বলা হলো কেন? এর কারণ তো একটা আছে অবশ্যই। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা সেই মেয়েটি যার নাম জেসিকা ওয়াটসন এমন একটা কান্ড ঘটিয়ে ফেলেছে যা বিশ্বরেকর্ডের অভিধা গ্রহণ করেছে। আর বিশ্বরেকর্ড যখন, তখন তার চুলচেরা বিশ্লেষণ তো হবেই।

যাই হোক, কান্ডটা শুনুন আগে। ১৮ অক্টোবর, ২০০৯। সিডনি হারবার থেকে পৃথিবীর পথে উজান ঠেলল এলা বেচ ছদ্রপুপ্তদ্রুতডবঙ্গ। এর ১৮ দিন পরে অর্থাৎ ৫ নভেম্বর এলা বেচ পার করল টোঙ্গা, একে একে পার হয়ে গেল নিউজিল্যান্ড ও ফিজি। ১৬১ ডিগ্রী ৪০ ইঞ্চি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত জার্ভিস দ্বীপও অতিক্রম করল জাহাজটি। তার পরবর্তী গন্তব্য হলো ১৫৬ ডিগ্রী ২০ ইঞ্চি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত কিরিটিমাটি। মাত্র ৩৬ দিনেই এই দুই পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের বিস্তর ব্যবধান ছুঁয়ে ফেলল এলা বেচ। সাতসমুদ্র তেরো নদীর দীর্ঘ যাত্রাপথে আরও বেশ কিছু নাম উল্লেখযোগ্য। যেমন-কেপ হর্ন, পয়েন্ট নেমো, ফকল্যান্ড আইল্যান্ড, প্রাইম মেরিডিয়ান, পশ্চিম হেমিস্ফিয়ার থেকে পূর্ব হেমিস্ফিয়ার ইত্যাদি। আর 'সাত সমুদ্রের' মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো, অতলান্তিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর এবং অবশ্যই অস্ট্রেলিয়ান উপসাগর।

২১০ দিনের এই যাত্রাপথে বহু ঝড়-ঝাপটার সম্মুখীন হতে হয়েছে এলা বেচ-কে। তবুও থামানো যায়নি তাকে। কারণটা জানেন? ওই জাহাজের নাবিকের নাম জেসিকা ওয়াটসন, যার অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয় আগেই পেয়েছেন এবং যার অদম্য মনোবল চরম আঘাতেও এলা বেচ-কে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। নইলে ভাবুন, সিডনি হারবার থেকে রওনা দেওয়া একরত্তি জাহাজটি পাড়ি দিয়েছে ২৩,০০০ নটিক্যাল মাইল। ইয়াচেটের সিডনি হারবার থেকে গত অক্টোবরের ১৮ তারিখ রওনা দিয়ে পাক্কা ২১০ দিন বাদে ১৫ মে সিডনি হারবারেই প্রত্যাবর্তন-এর মুহূর্তে ষোড়শী থুড়ি সতেরোশী নাবিককে (সে নাবিকদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠও বটে) শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে আপামর বিশ্ববাসী। কারণ এত কম বয়সে একটানা, একজন সহযোগী ছাড়া স্রেফ একাকী বিশ্বভ্রমণে (বিশ্বের তিনভাগই যেখানে জল, আর এই জলপথেই যখন বিশ্বভ্রমণ তখন এতে অন্যান্য বিশ্বভ্রমণ-এর তুলনায় একটু বেশি মেহনত তো হয়েছেই) -এর নজির বিশ্বের বিরলতম ঘটনা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও হারিয়ে যাওয়া দলিল

সোহরাব হাসান

৯ মে একটি পত্রিকায় 'ট্রুথ লস্ট, মোস্ট মিলিটারী রেকর্ডস অব বাংলাদেশ ওয়ার মিসিং' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপে। এতে বলা হয়, 'ভারতের সামরিক বাহিনীর কাছে থাকা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ধ্বংস করা হয়েছে। এসব নথিপত্রের মধ্যে ছিল যুদ্ধের সময় তৈরি করা মুক্তিবাহিনী গঠনের ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পর্যালোচনা ও প্রশংসা-সম্বলিত দলিল, যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা ও অন্যান্য স্পর্শকাতর তথ্য। কলকাতার ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চ লীয় কমাণ্ডের অধীনে এসব দলিল রক্ষিত ছিল। কিন্তু একাত্তরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই তা ধ্বংস করে ফেলা হয়।'

কে ধ্বংস করলেন? তখন ইস্টার্ণ কমাণ্ডের দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, যিনি ষোল ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাংলাদেশ ও ভারতীয় যৌথ বাহিনীর পক্ষে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ দলিলে সই করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে পূর্বাঞ্চ লীয় কমাণ্ডের প্রধান হয়ে এসেছিলেন জেনারেল জ্যাকব। এই দুই জেনারেলের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো ছিল না, সে কথাও আমরা জানি। কিন্তু এত বড় কাজ ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কারণে হতে পারে না। এটি হয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। জ্যাকব একাত্তরের যুদ্ধ নিয়ে 'সারেণ্ডার অ্যাট ঢাকা' লিখলেও অরোরা কিছু লেখেননি। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে অরোরা বলেছিলেন, 'অনেকেই বিজয়ের ভাগীদার হতে চান। পরাজয়ের দায় কেউ নিতে চান না।'

ভারত যদি সত্যি সত্যি বিজয়ের ভাগীদার হতে চাইত, তাহলে তারা কেন একাত্তরের দলিলপত্র ধ্বংস করে দিল? মুক্তিযুদ্ধের দলিল ধ্বংস করা নিয়ে বিবিসি একটি বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রচার করেছে। এতে বলা হয়, একাত্তরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন জগজীবন রাম। তিনি এ কাজ করতে সাহস পাবেন না। সেনাপ্রধান ছিলেন ম্যানেক শ। তাঁর পক্ষেও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশেই সম্ভবত দলিলগুলো নষ্ট করা হয়েছিল।

এর একটি কারণ হতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন। তা হলে কি এসব দলিলে এমন কিছু ছিল, যা পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারত। রাজনৈতিক মহলে একটি কথা চালু আছে, আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের আগে ভারত যে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করেছে সেসব তথ্য প্রকাশ করতে চায়নি ভারত। তাঁরা না চাইলেই কি তথ্য গোপন থাকে? বাংলাদেশ ও ভারতের যেসব সেনা ও সিভিলিয়ান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, তারা বিভিন্ন লেখায় তা প্রকাশ করেছেন। আছে সরকারী বেসরকারী নানা নথি-পত্রে। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবান দলিলপত্র ধ্বংস করায় বা হারিয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হলো বাংলাদেশ। ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে, এজন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেই গৌরবজনক ইতিহাস ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের আড়ালে পড়ে যেতে পারে না। পাকিস্তান একাত্তরের দলিলপত্র ধ্বংস করতে পারে, কেননা তারা ছিল বিজিত শক্তি। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী ভারত বা বাংলাদেশ কেন দলিলপত্র ধ্বংস করল? ভারত ইস্টার্ণ কমাণ্ডের সদর দপ্তরে রক্ষিত সামরিক দলিলপত্র নষ্ট করলেও বেসামরিক দলিলপত্র তো ঠিকই রয়ে গেছে। সে সময় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর ছিল কলকাতার থিয়েটার রোডে। পূর্ববর্তী পাকিস্তান উপ-হাইকমিশন অফিস ১৭ এপ্রিলই বাংলাদেশ মিশন ও পররাষ্ট্র দপ্তর হিসাবে কাজ করে। এখন ভারত সরকার কি সেই ভবনগুলোও মুছে ফেলবে? ভারতের বিরোধী দল বিজেপি একাত্তরের দলিল ধ্বংসের ব্যাপারে তদন্ত দাবী করলেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তাহলে কি আমরা ধরে নেব, ভারতের মতো বাংলাদেশও একাত্তরের দলিলপত্র সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে? আমরা বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান জানতে চাই।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ধ্বংসের কাজ যে শুধু ভারতে হয়েছে তা নয়, বাংলাদেশের ভেতরেও আমরা অনেক দলিলপত্র নষ্ট করে ফেলেছি। মুজিবর সরকারের যেসব কাগজপত্র ট্রাক ভর্তি করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল, তা কোথায় রাখা হয়েছিল? কারা সেসব নষ্ট করে ফেলেছেন? ২০০৮ সালের জুন মাসে জানানো হয়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয়েছিল, তার মূল কপি সরকারী মহাফেজ-খানা থেকে হারিয়ে

গেছে। এখন জাতীয় মহাফেজখানায় ঘোষণাপত্রের ফটোকপি আছে। কীভাবে এরকম একটি মূল্যবান দলিল নষ্ট হলো, সে ব্যাপারে কোনও তদন্ত হয়েছে বলেও আমাদের জানা নেই। মুক্তিযুদ্ধের এ রকম অনেক দলিলপত্র ও প্রমাণ নষ্ট হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের যে উদ্যোগ নিয়েছিল, পঁচাত্তরের পর তা বন্ধ হয়ে যায় বা বন্ধ করে দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমানের আমলে হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে 'স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প' নামে পৃথক একটি প্রকল্প নেওয়া হয়।

এরপর ১৫ খণ্ডে 'স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস ঃ দলিলপত্র' প্রকাশিত হলেও অসংখ্য দলিল অপ্রকাশিত থেকে যায়। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে প্রকল্পটি বন্ধ করে দেন। কিন্তু অপ্রকাশিত দলিলপত্র-গুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছে আমরা জানি না।

স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, তা দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক, হারিয়ে যেতে শুরু করে। ডিসেম্বরের বিজয়ের পর বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্তে একটি গণকমিশন গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিশন নাকি অনেক তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করেছিল। সরকারীভাবেও তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর কী হয়েছে? পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন ছাড়া কারও কাছে উল্লেখযোগ্য তথ্য-প্রমাণ আছে বলে জানা নেই। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি। যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য লাভে সবাই ব্যস্ত ছিলেন। কেউ বা 'রুশ-ভারতের সহায়তায় পাওয়া স্বাধীনতা'কে অসার প্রমাণ করতে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমে পড়েন। কেউ বিপ্লব সফল করতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চেয়েছেন (দেখুন জুলফিকার আলি ভুট্টোর কাছে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান আবদুল হকের পত্র)।

আবার এর বিপরীত চিত্রও আছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমগ্র জাতির। কতিপয় আলবদর, রাজাকার ও শান্তিবাহিনীর সদস্য ছাড়া সর্বস্তরের মানুষ কোন না কোনওভাবে এতে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা মুক্তিযুদ্ধকে দলীয় যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন, অগ্রাহ্য করলেন অন্যান্য দলের ভূমিকা ও অবদানকে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তৈরী হলো নানা উপদল, গোষ্ঠী ও বিভক্তি। পঁচাত্তরের আগে যেটি 'খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা ও অখাঁটি মুক্তিযোদ্ধা'র লড়াই ছিল, পঁচাত্তরের পর সেটিই 'স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের' সংঘাতে রূপ নেয়। সেই সংঘাত এখনও চলছে। হয়তো ভবিষ্যতেও চলবে।

২.

আমরা যখন হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস নিয়ে মনোবেদনা প্রকাশ করছি, তখন একাত্তরের ঘাতক-দালালরাও বসে নেই। দেশে-বিদেশে সক্রিয় রয়েছে তারা। পাকিস্তান যতই বলুক তারা যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধ বা মানবতা-বিরোধী অপরাধের বিচারের বিরোধী নয়, সেখানকার পত্র-পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছেই। গত ২৯ মার্চ ডন-এ একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইন্টারনেট সংস্করণে লেখকের নাম ছাপা না হলেও তিনি নিজেকে পাকিস্তানের প্রথম যুদ্ধ বন্দী হিসেবে দাবী করেন। তিনি লিখেছেন, ২০০৮ সালে 'ধাপ্পাবাজি'র নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে 'অপরাধ বিচার'-এর যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা বিরোধীদের প্রতি বৈষম্য তৈরি করবে এবং দেশে উত্তেজনা বাড়াবে। এরপর লেখক যোগ করেন, ১৯৭৫ সালের ১৪ আগষ্ট (প্রকৃত তারিখ ১৫ আগষ্ট) দেশপ্রেমিক বাঙালীরা 'স্বৈরশাসক' শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে এবং তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতাকে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করে। মুষ্টিমেয় কিছু উদার ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ছাড়া অধিকাংশ পাকিস্তানী এখনও বাংলাদেশের প্রতি বিদ্বিষ্ট। এর সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানপন্থীদের।

সম্প্রতি এক সেমিনারে বিএনপি-র নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেছেন, 'পারলে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ প্রমাণ করুক।' মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়েও দম্ভোক্তি করেছেন তিনি। এর আগে জামায়াতের নেতা আলি আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেছিলেন, বাংলাদেশে কোনও যুদ্ধাপরাধ হয়নি। এখানে কোনও যুদ্ধাপরাধী নেই। দুর্ভাগ্য, এই অস্বীকারের অপরাজনীতিতে বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়াও যোগ দিয়েছেন। কয়েকদিন আগে তিনি আইনজীবীদের এক সমাবেশে বলেছেন, 'মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের নামে সরকার জাতিকে বিভক্ত করতে চাইছে।' সরাসরি যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষ না নিয়ে খালেদা জিয়া বিচার-প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করার কথা বললে দেশবাসীর সমর্থন পেতেন। আওয়ামী লীগের দলীয় মস্তানি-সন্ত্রাসেরও বিরোধিতা আমরা করব। তাদের কর্মসূচী আমাদের পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধাপরাধের মতো জঘন্য অপরাধের বিচারের বিরোধিতা করতে পারি না।

অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন যেহেতু আমরা একাত্তরে অপরাধের মূল হোতা পাকিস্তানী সেনা সদস্যদের বিচার করতে পারিনি, সেহেতু এ দেশীয় অপরাধীদের বিচার করে কী হবে? অপরাধী কোন্ দেশের, কী তার ধর্ম বা গোত্র পরিচয়, বিচারের ক্ষেত্রে সেটি বিবেচ্য হতে পারে না। বিচার্য হলো, সে অপরাধ করেছে কি না। এতদিন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারিনি বলে ভবিষ্যতে করা যাবে না, তারও যুক্তি নেই। বরং দেশীয় অপরাধীদের বিচারের সওয়াল-জবাবে পাকিস্তানী সেনা ও সিভিলিয়ানদের অপরাধও উন্মোচিত হবে। তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বলা যাবে, পাকিস্তানীরা এই অপরাধ করেছে, তাদের বিচারের ব্যবস্থা করো। পাকিস্তানী, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার অন্যতম কারণ ছিল, ১৯৭৪ সালের ১০ এপ্রিল পাকিস্তান সরকার ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে সই করে বলেছিল, অভিযুক্তরা যেহেতু পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তানী ভূখণ্ডে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সে কারণে তারাই ১৯৫ জন অভিযুক্তের বিচার করবে। পাকিস্তান অতীতের ভুলের জন্য বাংলাদেশের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল। কিন্তু গত ৩৫ বছরেও তারা সেই বিচার করেনি। এমনকী অপরাধ তদন্তে গঠিত হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টও পুরো প্রকাশ করেনি। আমরা তাদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে বিচারের দায়টি তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাধা কোথায়? খালেদা জিয়া বলেছেন, বিচারের মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করা যাবে না। প্রকৃত সত্য হলো, গত ৩৯ বছরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়ার কারণেই জাতি বিভক্ত। বিভক্ত রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোও। এখন সুযোগ এসেছে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার। ৩৯ বছর ধরে ঘাতকেরা তাড়া করে ফিরছে। সময় এসেছে তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর।

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ)

কোরেল

কোরেল

পরম্পরা

হিন্দু শাস্ত্রে পূজা-বিজ্ঞান

রবীন সেনগুপ্ত

নিজস্ব মনগড়া পদ্ধতিতে যে কোনও উপাদান দ্বারা ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করে, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, অশ্লীল নৃত্য-গীতসহ যে সকল পূজা করা হয় সেগুলি হিন্দু শাস্ত্রসম্মত নয়, অতএব সেগুলির মধ্যে বিজ্ঞানও নেই। এইসব ধরনের পূজায় দৈবীভাব শুভশক্তি জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে আসুরিক ভাব ও অশুভ শক্তির বাড়-বাড়ন্ত ঘটে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্রসম্মত পূজায় যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার আছে।

যারা আবৃত্তি নিয়ে চর্চা করেন তারা বলেন যে প্রতিদিন নিয়ম করে কবিতা আবৃত্তি করলে সুন্দর সুন্দর শব্দের প্রতিক্রিয়ায় শরীর ও মন উজ্জীবিত থাকে। হিন্দু পূজা-পদ্ধতিতে তাই বহু যুগ পূর্ব থেকেই পূজার সময় অপূর্ব সব বাক্য সহযোগে স্তব-স্তোত্রগুলিকে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করার নির্দেশ রয়েছে।

প্রাণায়াম বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে প্রতিদিন একটু করে শ্বাস-প্রশ্বাসের কিছুটা ব্যায়াম আমাদের অবশ্যই করা উচিত। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ তাই পূজার সময় প্রাণায়াম ও শঙ্খ বাজানোর বিধান রেখেছেন। শঙ্খ বাজানোতে যে শ্বাসের ব্যায়াম হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যোগাসনবিদরা বলেন প্রতিদিন একটু করে যোগাসন সকলেরই করা দরকার। পূজার সময় তাই হাঁটু মুড়ে বসার মাধ্যমে বজ্রাসন, প্রণাম করার সময় অর্ধকূর্মাসন এবং অন্যান্য সময় অঙ্গন্যাস ও অঙ্গুলি ন্যাসের ব্যবস্থা করেই রেখেছেন। পূজার সময় পদ্মাসনে বসে একাগ্র মনে ধ্যান করার একটা ব্যাপারও হিন্দু শাস্ত্রে রয়েছে। তারপর রয়েছে স্নান করে ক্ষৌরকর্ম পূর্বক পূজা করার বিধি। এতে পরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য হয় মানুষ। খাদ্য বিজ্ঞানীরা বলেন প্রতিদিন কিছু ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। এমনিতে অনেকেই ফল খেতে চায় না। পূজার সময় ফল নিবেদনের একটা ব্যাপার থাকায় প্রসাদ হিসাবে বহুজন কয়েক টুকরো ফলের মাধ্যমে ভিটামিনের চাহিদা পূরণের সুযোগ পান।

এছাড়াও পরিবেশের বাতাসকে কীটানুমুক্ত করার জন্য ধূপ-ধূনার ব্যবহারের কথা তো সর্বজনবিদিত। ফুল পাতা ও আল্পনা দিয়ে পূজার বেদী ও সংলগ্ন এলাকা 'সাজানো'র মাধ্যমে চারুকলার চর্চাও খানিকটা হয়ে যায়। নিরাকার পূজায় ভক্তি ও মনঃসংযোগ আনা বেশ কঠিন কাজ। তাই সুন্দর বিগ্রহের ব্যবস্থাও হিন্দু পূজা পদ্ধতিতে রয়েছে। মূর্তি নির্মাণ করা, মূর্তিকে অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং গহনা, কেশ ও পোষাকসহ সাজানোটাও একটা আর্টের বিষয়। কাঁসর ঘণ্টার ব্যবহার বাদ্যযন্ত্র চর্চার বিষয়।

এইভাবে একটা পূজার মাধ্যমে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা, দেহের শুদ্ধি, প্রাণায়াম, যোগাসন, আবৃত্তি, গীত, বাদ্য, পুষ্টিকর প্রসাদরূপ খাদ্য গ্রহণ, ইত্যাদি কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। খৃষ্টান বা মুসলিমদের প্রার্থনায় একসঙ্গে এত কিছুর অভ্যাস অনুশীলনের ব্যবস্থা নাই।

হিন্দুর এই পূজা-বিজ্ঞান তাই মনু মহারাজ, শ্রীরামচন্দ্র, চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এর মতো আধ্যাত্ম ও লোকায়ত জগতের মহাতারকারা নিজ জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন। আজকের এই মহাব্যস্ততা ও নাস্তিকতার প্রাবল্যপূর্ণ যুগেও এদেশের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ও মহাসফল রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, চিত্রতারকা, গায়ক, খেলোয়াড় ও অফিসাররা এই হিন্দু পূজা-বিজ্ঞান অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকেন।

পূজা-বিজ্ঞানের প্রয়োগে যদি ভুল হয় তাহলে যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায় এই ভুল করছে তারা দিন দিন অতিক্রোধী বা অতি ধীরগতি সম্পন্ন, নির্বোধ, ক্লীব ও সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই পূজা-বিজ্ঞান ঠিক মতো প্রয়োগ করলে দিন দিন মানুষের উন্নতি ঘটে। তার চেহারা, প্রতিভা, কর্মক্ষমতা, ঔদার্য, সৃজনশীলতার আরও উন্নতি ঘটে ধীরে ধীরে। পূজা-বিজ্ঞানে নিয়মিত অংশ নেওয়া লতা মঙ্গেশকর, শচীন তেণ্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলি, অমিতাভ বচ্চন, বিড়লা পরিবার—এর বড় প্রমাণ ও জীবন্ত উদাহরণ। অপরদিকে পূজা-বিজ্ঞানে নিয়মিত অংশ না নেওয়া কমিউনিস্টদের দিন দিন হতশ্রী অবস্থা দেখছি।

সাধারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে পূজা বিজ্ঞানের সাদৃশ্য ঃ

১। সাধারণ বিজ্ঞানে যেমন ল্যাবরেটরী ও প্রতিষ্ঠান লাগে, পূজা-বিজ্ঞানের জন্যও তেমনই লাগে ঠাকুরঘর ও আশ্রম।

২। বিজ্ঞানে যেমন মাইক্রোস্কোপ, তুলাযন্ত্র, টেস্ট টিউব, ক্লিনিক্যাল ফ্লাস্ক, নানা প্রকার শুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি লাগে, পূজা-বিজ্ঞানের জন্য তেমনই প্রয়োজন হয় দেবদেবীর মূর্তি বা ছবি, ধূপ-ধুনা, প্রদীপ, আসন, জপমালা, শঙ্খ, তুলসী পাতা, কবচ, স্টোন বা গ্রহরত্ন, যজ্ঞকাষ্ঠ, ঘৃত, ফল, ফুল, ও মন্ত্রস্তোত্র ইত্যাদি।

৩। সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যেমন স্কুল কলেজে অর্থ জমা দিয়ে অ্যাডমিশান নিতে হয়, পূজা-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যও আধ্যাত্মিক কোনও সংগঠনে কিছু অর্থ দক্ষিণা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়।

৪। সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পাশ করা ডিগ্রীধারী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও তাদের আনুগত্য লাগে। পূজা-বিজ্ঞানের জন্যও সিদ্ধ গুরুদেব, পুরোহিত ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজন হয়।

৫। সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যেমন নানা প্রকার গ্রন্থ লাগে পূজা-বিজ্ঞানকে জানার ও বাস্তবে প্রয়োগের শিক্ষার জন্যও তেমনই বেদ-বেদান্ত-পুরাণ গীতা, পুরোহিত দর্পণ, পঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থ লাগে।

৬। সাধারণ বিজ্ঞানে যেমন অ্যাসিডে জল মিশিও না, জলে অ্যাসিড মেশাও—এই জাতীয় নিষেধাজ্ঞা আছে, পূজা-বিজ্ঞানেও সেই ধরনের নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সাধারণ বিজ্ঞানের মতো আধ্যাত্মবিজ্ঞানেও নানা প্রকার সূত্র, সংজ্ঞা ব্যাখ্যাও রয়েছে।

৭। সাধারণ বিজ্ঞানে যেমন প্রচুর সফল ব্যক্তিত্ব ও সফল কর্মের সাথে অসফল ব্যক্তিত্ব ও ক্ষতিকারক ব্যাপারও রয়েছে, পূজা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই একই ব্যাপার। পূজা সর্বদা সফল হয় না। সবার পূজাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ছুঁৎমার্গ বা অস্পৃশ্যতার মতো বহুজনের আপত্তিকর বিষয়ও ঘটে থাকে মাঝেমধ্যে।

কি কি উপকার হতে পারে পূজা-বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহারে?

১। পূজা-বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহারের ফলে পারিবারিক বা ব্যক্তি-জীবনে শান্তি আসে।

২। পূজার ফলে শোক-আঘাত বন্ধ হয়ে যায় না। কর্মফল ও পরিস্থিতির শিকার মানুষকে কষ্ট দেবেই। কিন্তু পূজাকারী ব্যক্তিরা বা পরিবার বা সম্প্রদায়রা এইসব শোক আঘাত সামলে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

৩। পূজার দ্বারা মনঃসংযোগ ক্ষমতা বাড়তে পারে।

৪। পূজার দ্বারা যথেষ্ট জনসংযোগ হয়। পূজার সাজসজ্জা, আপ্যায়ন, প্রসাদ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু মানুষ পূজাকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

৫। এই জনসংযোগের হাত ধরে ও দৈব কৃপার বলে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক সাফল্য আসার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৬। পূজার বিশেষ প্রয়োগে বেশ কিছু রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৭। পূজার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা যায়।

৮। বিশেষ ধরনের পূজায় জ্যোতিষ গণনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৯। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও পূজা সাহায্য করতে পারে।

১০। প্রেম-ভালোবাসার ক্ষমতা পূজার দ্বারা বৃদ্ধি পেতে পারে।

রাধাকৃষ্ণের পূজা সাধারণত প্রেম-ভালবাসা ভক্তি-কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতালাভ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অধিক প্রযুক্ত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও সেটিকে ধরে রাখার জন্য প্রাচীন রাজা জমিদার থেকে শুরু করে আজকের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের অনেকেই দুর্গা ও কালী পূজা করে থাকেন। ত্যাগ বৈরাগ্যের জন্য শিবপূজা, ধন-সম্পদের জন্য গণেশ-লক্ষ্মী ও কুবেরের আরাধনা যথেষ্ট ফলপ্রদ হয়। বিদ্যালাভের জন্য সরস্বতী পূজার উদাহরণ রয়েছে। তবে নিষ্কাম কর্মের ও শুদ্ধ জ্ঞান ভক্তির জন্যও পূজা করা যায়। সেই প্রকার পূজাতেই আধ্যাত্মিকতা সবচেয়ে অধিক থাকে। তাই সেই প্রকার পূজাই শাস্ত্রে সর্বাধিক প্রশংসনীয়। কারণ চাওয়া পাওয়া হিসাব-নিকেশের ঊর্ধ্বে যে পূজা, আয়ত্ত করতে বহু জন্ম অতিক্রম করে আসতে হয় মানুষকে। ইসলামের মতে মানুষ হলো আল্লার বান্দা বা দাস। এই দাস ভাব ছাড়া আর কোনও প্রকার ভাবধারা ইসলাম সম্প্রদায়ে নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ সম্প্রদায় মাত্রই নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার সত্য ছাড়া বেশী কিছু ভাবতে পারে না। হিন্দু যেহেতু সম্প্রদায় নয় তাই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ভিন্ন প্রকার সম্পর্কের কথা সেখানে স্বীকৃত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সখা ভাবে, শান্ত ভাবে, মধুর ভাবে, বাৎসল্য ভাবে এবং দাস্য ভাবে আরাধনা করার প্রচলন বহুযুগ পূর্ব থেকেই রয়েছে। বেদের বক্তব্য হলো আমরা সবাই 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' আমরা সবাই সেই অমৃতময় সত্ত্বার পুত্র। দাস ভাব একটা উপাসনার দিকমাত্র। জীব মাত্রই কৃষ্ণের দাস—এই উক্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করলেও উনি গোপাল আরাধনা, মধুর ভাব কিম্বা সখী ভাবের আরাধনার বিরোধিতা করেননি। রাজা রামমোহন রায় বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুররা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করলেও মুসলমানদের মতো হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমা ও মন্দির ভেঙ্গে দেননি। কারণ মুসলমানরা নিরাকার আরাধনা করলেও তাদের সম্প্রদায়টা দেব সম্প্রদায় নয়, তারা দেববিরোধী বা আসুরিক সম্প্রদায়। কারণ কোরাণে আল্লা যে সকল মন্তব্য করেছেন তা কোনও দেবতার পক্ষে করা সম্ভব নয়। একমাত্র কোনও আসুরিক শক্তিই বলতে পারে যে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ, সংগীত, নাট্য, গীত, নৃত্য নিষিদ্ধ। আজ অবধি সমস্ত দেবতাকেই দেখা গেছে দেবমূর্তি, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষকতা করতে, মহিষাসুর ও রাজা বেনের মতো অসুররাই পূজা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছিল। একটা মানুষকে নীতি জ্ঞান ও সংগীত, নৃত্য, চিত্র ও মূর্তি আরাধনার চর্চার মাধ্যমে দেবতার মতো গড়ে তোলাই হিন্দুধর্মের লক্ষ্য। সেখানে ইসলামের লক্ষ্য সমস্ত কলাচর্চাকে হারাম ঘোষণা করে একটা মানুষকে অসুরে পরিণত করা যাতে তারা অবহেলায় সুন্দর সুন্দর মন্দির, মূর্তি, ভেঙ্গে ফেলতে পারে, নারীধর্ষণ করতে পারে, গো-হত্যা করতে পারে।

রমজানের উপবাস, বোরখা এগুলি ইসলামে অবশ্য পালনীয়। কিন্তু হিন্দুরা কোনও উপবাস করতে বাধ্য নয়। কোনও হিন্দু হয়ত বছরে দু-একবার শিবরাত্রি ও কালীপূজার উপবাস ক'রল, কেউ একাদশী ক'রল, কেউ কোনও উপবাসই ক'রল না। তাহলেও তার হিন্দুত্বের হানি হয় না। কেউ কোনও পূজা না করে সমাজসেবামূলক কাজকেই পূজা বলে মনে করলেও সেও হিন্দু, আবার কেউ কিছুই না করলেও সে হিন্দু। যখন তার মনে হবে কিছু ধর্ম চর্চা করি তখন সে কীর্তন, প্রাণায়াম, দীক্ষাগ্রহণ —এসব করতে পারে। জোর করে মানুষের উপর পূজাপাঠ চাপিয়ে দেওয়াটা হিন্দুর বৈশিষ্ট্য নয়।

একটি গ্রামের রূপকথা

জয়রাম মণ্ডল

ভারতবর্ষের অনুন্নত রাজ্য মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলায় জববলপুর থেকে প্রায় ১০০ কি মি দূরে ছোট্ট শহর করেলি। আর সেখান থেকে আরও ৫ কিমি এগিয়ে গেলে পৌঁছানো যাবে মোহদ—এদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। একদা ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন অজ গ্রাম "মোহদ", আজ মাত্র ২০ বৎসরের ব্যবধানে এক আদর্শ গ্রাম। মোহদ-এর অজ পাড়া গাঁ থেকে আদর্শ গ্রাম হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছেন শ্রী সুরেন্দ্র সিংহ চৌহান। শিশু-বৃদ্ধ সকলের পরম শ্রদ্ধেয় 'ভাইয়াজী' অর্থাৎ দাদা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক প্রবীণ স্বয়ংসেবক। দিল্লীর জিজ্ঞাসু এক সাংবাদিক প্রমোদ সাইনির প্রতিবেদনেই ফুটে উঠেছে এই রূপকথার কাহিনী ঃ

৪৫০টি পরিবার, ৪ হাজার অধিবাসীর এই গ্রাম আজ তাবড় তাবড় গ্রামোন্নয়ন আগ্রহীদের পরিদর্শনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ৭৬ বছরের যুবক ভাইয়াজী ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ;কৃষিকাজ এবং সংগঠন নিয়েই গ্রামে আছেন। একা কৃতিত্ব নিতে চান না। বলেন, 'আমি একা কিছুই করিনি, গ্রামের স্বয়ংসেবকরাই করেছে সব, আমি উপলক্ষ মাত্র।' ভাইয়াজী দলিত, জনজাতি তথাকথিত উচ্চবর্ণ—যে কোনও পরিবারেরই অন্তরের অন্তরঙ্গ, সকলের পরমাত্মীয়, আনন্দের হাওয়ার বার্তাবহ। বললেন, কুড়ি বছর আগেও গ্রামের জলের কল বা কুঁয়ো দলিতরা ব্যবহার করতে পারতো না—স্বয়ংসেবকদের প্রচেষ্টায় আজ সব বিভেদ অন্তর্হিত।

গ্রামে কারোর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে 'জয় শ্রীরাম' বা 'নমো নমঃ' দ্বারা সম্ভাষণ;এমন কী তিন-চার বছরের শিশুদের মধ্যেও এই সংস্কার এসে গেছে। মোহদ গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে ওঁ, স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা থাকে। প্রতিটি পরিবার সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত।

সংস্কার ও পরিবেশ

পরিবেশ নিষ্কলুষ রাখার উদ্দেশ্যে ভাইয়াজী কিছু অভিনব পদ্ধতি প্রচলন করেছেন। জ্বালানীর জন্য বৃক্ষ নিধন বন্ধ করার জন্য মেয়েরা প্রতি বছর বৃক্ষে রাখী বেঁধে ভ্রাতৃত্বের সম্মানে ভূষিত করে। এই গাঁয়ে ৩ হাজার গোরু এবং ১৫৪টি জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সব বাড়িতে জৈব গ্যাস থাকায় স্ত্বণ্ড-এর প্রয়োজনই হয় না। এই প্ল্যান্টে যে উত্তম গোবর সার তৈরি হয় তা চাষের পক্ষে খুব উপকারী। গাঁয়ে দীনবন্ধু মডেলের জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে, তাতে স্থান এবং খরচ কম লাগে। ভাইয়াজী বললেন, ২, ৩, ৪ এবং ৬ বর্গ মিটারের প্ল্যান্টের খরচ যথাক্রমে ১০ হাজার, ১২ হাজার, ১৪ হাজার এবং ১৬ হাজার টাকা। এখন দক্ষ লোকেরা বিভিন্ন রাজ্যে এরকম প্ল্যান্ট তৈরি করতে যাচ্ছে। গবেষণা চলছে বায়োগ্যাস দিয়ে ডিজেল ইঞ্জিন চালানো এবং সিলিন্ডারজাত করার।

গাঁয়ে চুরি নেই, কোনও প্রকার অত্যাচার বা নৃশংসতা নেই। রাস্তায় কেউ ময়লা ফেলে না, উন্মুক্ত স্থানে কেউ শৌচকর্ম সারে না। মামলা মোকদ্দমার বিষয় গাঁয়েই মিটিয়ে ফেলা হয়।

শিক্ষা

গ্রামের ৯৮ শতাংশ মানুষই শিক্ষিত। প্রায় ১০০০ গ্রামবাসী সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ। উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যাও কম নয়। ভাইয়াজী নিজে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ., প্রথম পুত্র সংগ্রাম সিংহ অর্থনীতিতে এম এ, দ্বিতীয়জন বি. এ, এল. এল. বি., সকলেই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামে দুজন পি. এইচ. ডি., এক ডজন স্নাতকোত্তর, ২০ জনের বেশি স্নাতক, ৩০ জন শিক্ষক, ২ জন সাংবাদিক, ৪ জন ইঞ্জিনীয়ার, ৩ জন ডাক্তার, ১ জন পুলিশ সুপার, ২ জন অবসরপ্রাপ্ত এবং ৩ জন বর্তমানে সেনা অফিসার।

গ্রামে ১ টি সরস্বতী শিশুমন্দির সহ ৪টি বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেকটি শিশু বিদ্যালয়ে যায়। সরস্বতী বন্দনা এবং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত দিয়ে বিদ্যালয় আরম্ভ হয়। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরাও সঙ্গীত গায়— অভিভাবকদের সম্মতিতেই। প্রত্যেক বাড়িতে রামায়ণ এবং গীতা রয়েছে, আর ভোরে পাঠ হয়। মুসলমানরা কোর-আন পাঠ করে।

সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬-তে, তারপর 'সংস্কৃত ভারতী'র উদ্যোগে আরও ৬টি প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে। বর্গে ১০০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০০ জনের বেশি ২০-এর নিচের বালক- বালিকা যারা সংস্কৃতে নিজের পরিচয় প্রদান করতে পারে। গ্রামেরই প্রমীলা দেবী সর্বভারতীয় 'কবিদ' পরীক্ষায় ২০০৪ সালে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

ছাত্রদের উদ্যান বিদ্যা, গ্রাফ্‌টিং ইত্যাদি শেখানো হয়। প্রতিবছর বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পাকাবাড়ির দেয়ালে লেখা থাকে নানা শিক্ষামূলক বাণী, সাধারণ জ্ঞানের বিষয়, নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্য, সরকারি ঘোষণার বিষয়বস্তু, হিন্দু জীবনের ১৬টি সংস্কার এবং নেশা ও পণপ্রথা বিরোধী জ্ঞাতব্য, পরিচ্ছন্নতা পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়।

গ্রামের উচ্চ শিক্ষিতরাই এই তথ্য সংগ্রহ করে এনে যোগ্যস্থানে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

চাষবাস

মোহদ গ্রামে চাষবাসের ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেহেতু সব চাষীরাই শিক্ষিত, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুফল গ্রহণ করতে কখনও কুণ্ঠিত নয়। রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক সম্পূর্ণ বর্জন, জৈব সারের ব্যবহার—এই তত্ত্বের সদ্ব্যবহার করে জমির উর্বরাশক্তিকে রক্ষা করে রাসায়নিক বিষমুক্ত প্রচুর সুস্বাদু ফসল উৎপাদন করা হয়। মেজর প্রভাত সিং চৌহান আগাম অবসর নিয়ে ছদ্দত্মত্রগ্ন গ্রামে বসবাস শুরু করেছেন। কেঁচো সার উৎপাদন এবং চাষে তা ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে জমির স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

চাষের ট্রাক্টরে ব্যবহৃত ইনভার্টারের ব্যাটারীর জন্য ডিস্টিল্‌ড ওয়াটারের পরিবর্তে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে ব্যবহারের পদ্ধতি শেখানো হয়।

স্বাস্থ্য

প্রত্যেক বাড়িতে শৌচালয় আছে। সবরকমের নেশা—পান, বিড়ি, সিগারেট, গুট্‌খা, মদ—সব নেশা বন্ধ করা গেছে। কয়েক বছর আগে ৬ জন কুষ্ঠরোগী এবং ১৩ জন সংক্রামক রোগগ্রস্ত গ্রামে ছিল। এখন ওরা সুস্থ। গ্রামে কোনও হেলথ সেন্টার না থাকলেও দুজন 'আরোগ্য রক্ষক' আছেন, তাঁরাই প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। দুটো পতঞ্জলি যোগ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করা হয়েছে। এখানে 'প্রাকৃতিক চিকিৎসা'র ব্যবস্থা আছে।

শিল্প

মোহদ গ্রামে ৫০ রকমের ছোট শিল্প এবং কুটির শিল্প আছে। চাষবাস এবং কুটির শিল্প আর তাদের বাজারজাত করা নিয়ে গ্রামের সকলেই ব্যস্ত, বেকার কেউ নেই। আর রয়েছে সংঘশাখা—প্রেরণার উৎস। ভাইয়াজী বলেন, "এ গ্রাম গ্রামই থাকবে, শহর হবে না। কিন্তু শহরের সকল নিত্য নতুন প্রযুক্তিগত সুযোগ গ্রামে আনা হবে।"

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।। ১২

শিশুকালে কবি কর্ণপুর মহাপ্রভু পায়ের বুড়ো আঙুল চুষেছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি ভগবান লীলা কীর্তন রচনা করেছিলেন।

যবন হরিদাস মহাপ্রভুর একজন প্রধান ভক্ত। হরিদাসের মৃত্যুর সময় তার মাথায় মহাপ্রভু হাত রেখেছিলেন।

হরিদাসের শ্রাদ্ধের জন্য মহাপ্রভু নিজে ভিক্ষা করেছিলেন।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)

মাধ্যমিক পাশ করেই চাকরির সুলুক-সন্ধান

।। নীল উপাধ্যায় ।।

শুধু দশম মান উত্তীর্ণ হলেই একগুচ্ছ সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার সুযোগ রয়েছে। চাকরি পাওয়াটা নির্ভর করবে কঠোর পরিশ্রম ও অনুশীলনের ওপর।

ক্লার্কশিপ পরীক্ষা ঃ

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য প্রতি বছর অনেক কর্মী নেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টরেটগুলিও বিভিন্ন সময়ে এই পরীক্ষার মাধ্যমে ক্লার্ক পদে কর্মী নিয়োগ করে।

টিকিট কালেক্টর ঃ

রেলের টিকিট কালেক্টরের জন্য পি এস সি যে গ্রুপ 'ডি' পদের পরীক্ষা নেয় তার ন্যূনতম যোগ্যতা অষ্টম মান হলেও মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের পরীক্ষায় বসতে বাধা নেই।

সহ-শিক্ষক ঃ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা-সংসদ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য যে সহ-শিক্ষক নিয়োগ করে এখনও পর্যন্ত তার ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক।

পুলিশ কন্‌স্টেবল ঃ

মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, উপযুক্ত শারীরিক গঠন ও কর্মকুশলতার দক্ষতা পালন করতে সমর্থ হলে পুলিশ কন্‌স্টেবল পদের জন্য আবেদন করা যায়। রাজ্য-পুলিশ, সি আর পি এফ, আর পি এফ, আর্মড ফোর্স, বি এস এফ-এ বছরভর অসংখ্য কর্মী নেওয়া হয়। নিরাপত্তা বা আধা-সামরিক বাহিনীতে পদপ্রার্থীর যোগ্যতা আরও কম—অষ্টম মান।

কর্মযোগ

কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে চাকরি

মাধ্যমিক স্তরের প্রার্থী নিয়োগের জন্য স্টাফ্ সিলেকশন কমিশন যে পরীক্ষাটি নেয় তার নাম কম্বাইন্ড ম্যাট্রিক লেভেল (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা। মূলত এল ডি ক্লার্ক, স্টেনো গ্রেড 'সি' ও 'ডি' পদে নিয়োগের জন্য এই পরীক্ষা। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণরা মেইন পরীক্ষায় বসতে পারেন।

সুতরাং চাকরি নেই বলে হা-পিত্যেশ না করে পরীক্ষার জন্য নিজেকে তৈরি করুন—সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

ব্যাঙ্কের বেতন চুক্তি ও কর্মচারীদের হতাশা

শ্যামল কুমার হাতি

"যতদিন শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে থাকবে ততদিনই রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলবেন। তাই শ্রমিকদের এমন এক পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা সব সময় শ্রমিকদের সুখ ও দুঃখের কথা খেয়াল রাখে।"

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন চুক্তি সই হয়েছে। হিসাব মতো ১৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এই বৃদ্ধি কর্মচারীদের সমস্ত রকমের সুবিধা মিলিয়েই। ইতিমধ্যে সরকারী কর্মচারীদের (কেন্দ্র ও রাজ্য) পে- কমিশনের সুপারিশও কার্যকরী হয়েছে। বিচার-বিবেচনা করলে কোনও ব্যাঙ্ক কর্মচারী খুশী নয়। তবে এবার ব্যাঙ্কের লোকজন আরও একবার পেনশনে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি করার সুযোগ পাবে। তার জন্য অবশ্য এবার যারা নতুন করে পেনশনে যোগ দেবে তাদের প্রচুর টাকা পেনশন ফাণ্ডে নগদে জমা করতে হবে। ইতিপূর্বে যারা কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন তারাও যদি পেনশনে যোগ দিতে চান তাদেরও প্রচুর টাকা দিয়ে তবেই যোগদান করতে পারবেন। তবে যারা ১৯৯৫ সালে পেনশনে যোগ দিয়েছিলেন তাদের পেনশন ফাণ্ডে টাকা দিতে হবে না। এটা সম্ভব হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে। ফলে যারা এবার নতুন করে পেনশন স্কিমে যোগ দেবেন তাদের আরও অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। চুক্তিটাই হয়েছে এই রকম— পেনশন ফাণ্ডে ব্যাঙ্ক-কর্মচারী ও অফিসারদের ১৮০০ কোটি টাকা দিতে হবে। তার সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ডে প্রতিষ্ঠানের দেওয়া ১০০ শতাংশ সুদ সহ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী এবং অফিসাররা বিগত চুক্তি শেষ হওয়ার ৩০ মাস পর আই বি এর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই করেছে। এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ার পর এই চুক্তি। ৩০ মাসের বকেয়া টাকার খুবই ক্ষুদ্র অংশ কর্মচারীরা হাতে পাবেন। কারণ সিংহভাগ টাকাই চলে যাবে পেনশন ফান্ডে। ইতিমধ্যেই অনেকে চিকিৎসার জন্য, ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য, মেয়ের বিয়ের জন্য প্রচুর টাকা ধারদেনাও করেছেন। শোধ দেওয়ার আশা ধুলিসাৎ হয়েছে এই চুক্তির ফলে। ব্যাঙ্কে কর্ম্মরত ৯টি ইউনিয়ন এক সঙ্গে লড়াই করার ফলেও শেষ রক্ষা হয়নি। তাই চুক্তির পর এবার আর কেউই রাজপথে আতসবাজী পোড়াননি। এই হলো সার্বিক চিত্র। সকল ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং অফিসারদের জানা কথা। এতে নতুন কিছুই নেই।

প্রশ্ন সেখানেই, কেন যৌথ আন্দোলন করেও আই-বি-এর কাছ থেকে বেশী দাবী আদায় করতে পারা গেল না? কি অভাব ছিল ব্যাঙ্ক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকজনদের? তারা কি কাজ করেন না? তারা কি সরকারি কর্মচারীদের থেকে কম কাজ করেন? দেশের প্রগতিতে কি তাদের কোনও যোগদান নেই? প্রশ্নগুলো যদি ১, ২, ৩ করে করা হয় তবে কেউই ব্যাঙ্ক-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকজনদের দোষ দিতে পারবে না। তবুও আমাদের শুনতে হয় সরকারি কর্মচারীরা পে কমিশনের টাকা পান বাজেট থেকে। আর ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা বেতনের বর্দ্ধিত টাকা পান তাদের পরিশ্রম করা ফলের উপর লাভ থেকে। যারা দেশ গড়ার কাজে সমানভাবে যুক্ত তাদের সাথে এই বৈষম্যমূলক ব্যবহার কেন? ব্যাঙ্কে কাজের একটা সময় আছে। চলতি কথায় ১০টা- ৫টা। কোথাও বা সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা। বর্তমানে এটা শুধু কথার কথা। ব্যাঙ্কে ভি আর এসের পর এবং স্বাভাবিক অবসরের পর ঠিকমতো নিয়োগ হয়নি। কর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত কমে গেছে। কোথাও কোথাও নতুন কিছু লোক নেওয়া হলেও তার বড় একটা অংশ এই শিল্পে যোগ দিতে চাননি। কারণ অন্য সমতুল্য কাজের থেকে এখানে পারিশ্রমিক এবং সুযোগ সুবিধা ভীষণ কম। এই চিত্র প্রায় সব প্রদেশেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ঘটেছে। তাই কাজের বোঝা এখানে ভীষণ বেশী। বর্তমানে দেশের কোনও শাখা অফিসের কাজ রাত ৮টা সাড়ে আটটার আগে শেষ হয় না। কখনও কখনও রাত নটা-দশটা বা তার থেকেও বেশী হয়। তবে ওই সময় অধিকাংশ অফিসাররাই থাকেন। ব্যাঙ্কে করণিক শ্রেণীর লোকেদের প্রতিদিন গড়ে এক দেড় ঘণ্টা বেশী কাজ করতে হয়। এই অতিরিক্ত কাজের জন্য কোথাও কোনও ওভারটাইম নেই। আসলে এই শিল্পের লোকজন কাজটা না মিলিয়ে বাড়ি যেতে পারেন না। বা পরের দিনের জন্য ফেলে রাখতেও পারেন না। তাই যত সময় ধরে ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে লাইট জ্বলে তার অনেক আগেই সরকারি অফিস অন্ধকারে ডুবে যায়। সেখানে তখন ভুতের আনাগোনা শুরু হয়।

তাই প্রশ্ন যে শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীরা কঠিন পরিস্থিতে কাজ করছে এবং যারা যারা প্রতিদিন দেশের প্রগতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তাদের জন্য সঠিক ভাবনা নেই কেন? কি-ই বা অপরাধ সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের?

সরকার নিজের আখের গোছাতে ব্যাঙ্ক শিল্পকে বার বার ব্যবহার করবে আর তার জন্য লোকসান হলে তার দায়ভার নিতে হবে এই শিল্পের কর্মচারীদের। এ কেমন ব্যবস্থা?

এক একবার অর্থমন্ত্রী বদল হবে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক সিদ্ধান্তেরও বদল হবে। কেন্দ্রে যখন জনার্দ্দন পূজারী মন্ত্রী ছিলেন তিনি "লোন মেলা" করে দেশের গোটা ব্যাঙ্ক শিল্পকেই নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন। একজন অর্থমন্ত্রীর খেয়াল হলো তার জেলায় নতুন করে ১০০টা ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হবে। ব্যাস, সবকাজ ফেলে ছোট ৫-৬ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের শাখা খুলতে! কোথাও কোথাও একই বাড়িতে ১১/২০টি শাখা খুলে অর্থমন্ত্রীকে খোসামোদ করতে হয়েছে কোনও কোনও ব্যাঙ্ককে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা পেনশন পান। তার জন্য কখনও কোনও কর্মচারীকে ফাণ্ড গঠনের নামে টাকা দিতে হয়নি। তাহলে ব্যাঙ্ককর্মচারীদের পেনশন ফাণ্ডে টাকা দিতে হয় কেন? এর আগে যারা পেনশনে সই করেছিলেন তাদের জন্য ওই ফান্ডে সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা টাকা দিয়েছিলেন। এবার কোর্টের আদেশে নিয়ম বদল হলো। অর্থাৎ যারা আগে পেনশনে যোগ দিয়েছে তাদের ফাণ্ডে আর টাকা দিতে হবে না। কোর্টের আদেশের ফলে ১৮০০ টাকার বোঝা এবার যারা নতুন করে পেনশনে যোগ দেবে তাদের উপর পড়ল। কোর্টের আদেশ বলে সবাই চুপ। কোর্ট তো এর আগে শাহবানু মামলায় রায় দিয়েছিল। সরকার অর্ডিন্যান্স করে সেই রায় বাতিল করেছিল। এবারও যদি তাদের সদিচ্ছা থাকত তাহলে এবারও অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারত। আসলে সরকার দেখে কারা ভোটের সময় বেশী বেগ দিতে পারে, তাদের ঘাঁটিও না। তাদের তুষ্ট কর। মন্ত্রীরা জানে মুসলিম ভাইরা ব্লক ভোট দেয়। তাই তুষ্টিকরণের ব্যবস্থা সেখানে। সরকারি কর্মচারীরা বিগড়ে গেলে সরকার টালমাটাল হয়। তাই তাদের তুষ্ট করতে হয়। তাদের নানান সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ সরকারি অফিসে গেলে আমাদের কি ভোগান্তি হয় তা আর কারও অজানা নয়।

ব্যাঙ্ক শিল্পের লোকজনদের সঙ্গে এই বিমাতৃসুলভ ব্যবহার কেন? এর আরও একটা কারণ আছে। যারা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তারা সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী। তার সুবাদে তারা সবাই পেনশন সমেত সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সুবিধা ভোগ করেন। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কার্স এসোসিয়েশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যান হন। তারা কি করে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দুঃখের কথা বলবেন? সেই জন্য তারা নির্বিকার থাকেন। এর সঙ্গে নিন্দুকেরা কেউ কেউ বলেন ব্যাঙ্কে লাল পার্টির লোকজন বেশী আর অন্য শিল্পে লালের বদলে গৈরিক বা জাতীয়তাবাদীরা বেশী। তাই সেখানে ভোগান্তি নেই। ব্যাঙ্ক সমেত অর্থ লগ্নিকারী সংস্থায় লালদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এত ভোগান্তি। শুরুটা ওরা ভালই করে ছিল, সকলকে নিয়ে, ক্রমে ক্রমে কম্যুনিস্টদের আসল রূপ ওরা ধারণ করে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় ব্যাঙ্ক-শিল্পের কিছু জাতীয়তাবাদী মানুষ ইউনিয়নের সভায় চীনের ভারত আক্রমণ-এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনতে চাইলে সত্যকারের কমরেডরা রে-রে করে তেড়ে এসে তাদের মারধোর করে সভাস্থল থেকে বার করে দেয়। শুধু তাই নয়, ওরা ওখানে চাইনিজ মুক্তি সেনাদের স্বাগতম জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। শুরু হলো জাতীয়তাবাদী মানুষের ওখান থেকে সরে আসা, দুর্বল হতে লাগল সংগঠন। জাতীয়তাবাদীরা তৈরী করল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জাতীয় সংস্থা (ত্ত্বখচ্ব) এবং পরে ব্যাঙ্ক অফিসারদের জাতীয় সংস্থা (ত্ত্বখচ্খ), উভয়েই ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সম্পর্কিত ইউনিয়ন। পরে ৮০- দশকে প্রয়াত জ্যোতিবাবুর তত্ত্বাবধানে আবার ভাঙন হয়, তৈরি হয় বি ই এফ আই। শুরু হয় ব্যাঙ্কের সমস্যা থেকে অনেক দূরের সমস্যা নিয়ে ব্যাঙ্কে আন্দোলন। রাজনৈতিক কারণে শুরু হয় ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ডাকা। বোফর্স কামানের ইস্যুতেও ব্যাঙ্ক বন্ধ। বারবার এরা ব্যাঙ্কের প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে ছিল। বেশীর ভাগ ব্যাঙ্কে এ আই বি এর লোকেরাই কর্মচারীদের প্রতিনিধি হয়ে বোর্ডের সভায় প্রতিনিধিত্ব করেছে। এরা সবাই ব্যাঙ্কের বোর্ডের মাননীয় সদস্য। ঋণ নিয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিভিন্ন সময়েই তারা ব্যাঙ্ককে দুর্বল করেছে। কই তার জন্য তো ওই প্রতিনিধিরা কখনই বোর্ডের সভায় আওয়াজ তোলেননি। কেন তারা এই কাজ করেছেন তা আমাদের অজানাই রয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের বেখেয়ালি কাজ কর্মচারীদের প্রতিনিধি হয়ে যাদের দেখার কথা ছিল তারা নির্লিপ্ত থাকায় ব্যাঙ্ক-শিল্পের লোকসানের বোঝা সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীকেই বইতে হচ্ছে। যদিও বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ওই দৈন্যদশা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। তার জন্য সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। আজও তার থেকে নিষ্কৃতি নেই।

যতদিন শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে থাকবে ততদিনই রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলবেন। তাই শ্রমিকদের এমন এক পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা সব সময় শ্রমিকদের সুখ ও দুঃখের কথা খেয়াল রাখে। শ্রমিকদেরও উচিৎ যে দল যত শ্রমিকদের হয়ে কথা বলবে তাদের ততই সমর্থন করা। অন্য দিকে যে দল যত শ্রমিকদের বিরোধ করবে শ্রমিকরাও তাদের ততই বিরোধ করবে। তবেই শ্রমজীবী মানুষ ও ব্যাঙ্ক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের সুদিন আসবে। আমরা তার প্রতীক্ষায় রইলাম।

আদর্শভ্রষ্ট কমিউনিস্ট দের জন্য বিভাস চক্রবর্তীর নাটক

‘শৃণ্বন্তু কমরেডস্’

বিকাশ ভট্টাচার্য

১৯২০-র ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সোভিয়েতে কমরেড লেলিনের কর্মব্যস্ত একটা দিন নিয়ে ২ ঘণ্টার নাটক “শৃণ্বন্তু কমরেডস্”। গৃহযুদ্ধ, সীমান্ত-সংঘর্ষ, অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্যের অভাব, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সবচেয়ে যা চিন্তার— কমরেডদের একটা বৃহৎ অংশের অশিক্ষা ও জনগণের স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা। সব মিলিয়ে নতুন শ্রমিক রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের সামনে এক প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা চিহ্ন! যে শ্রমিক রাষ্ট্রের যাত্রাপথ সহজ হবে ভাবা গিয়েছিল, সামনে দেখা গেল তার পথ অনেক কঠিন। সোভিয়েতের সেই কঠিন সময়কে নাটকে তুলে এনেছিলেন মিখাইল সাতরঙ ১৯৭৭ সালে তার লেখা ‘ব্লু হর্স অন রেড গ্রাস’-এ। ১৯৭৭ সালের রাশিয়া তো লেলিনের কাল পেরিয়ে স্তালিন যুগের অবসান ঘটিয়ে ক্রুশ্চে ভ-বুলগানিনের সংশোধনবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে ব্রেজনেভের যুগে পৌঁছেছিল। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের স্বপ্ন তখন দূর-অস্ত। তবু মিখাইল সাতরঙ ৫৭ বছর পরে লিখেছিলেন এই নাটক, যে নাটকে লেলিনের মুখে শুনি ‘বেয়নেট দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করা যায় না। বড় জোর ব্যারাক সৃষ্টি করা যায়।’ এই নাটকেই এক জায়গায় লেলিন তাঁর সহকর্মীকে একটা পেনসিল কারখানা তৈরির গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন। না, রাশিয়ায় তখন বুনিয়াদি শিক্ষার আশু প্রসারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে গেছে। তবু তিনি একটি পেনসিল কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দারুণভাবে

রঙ্গম

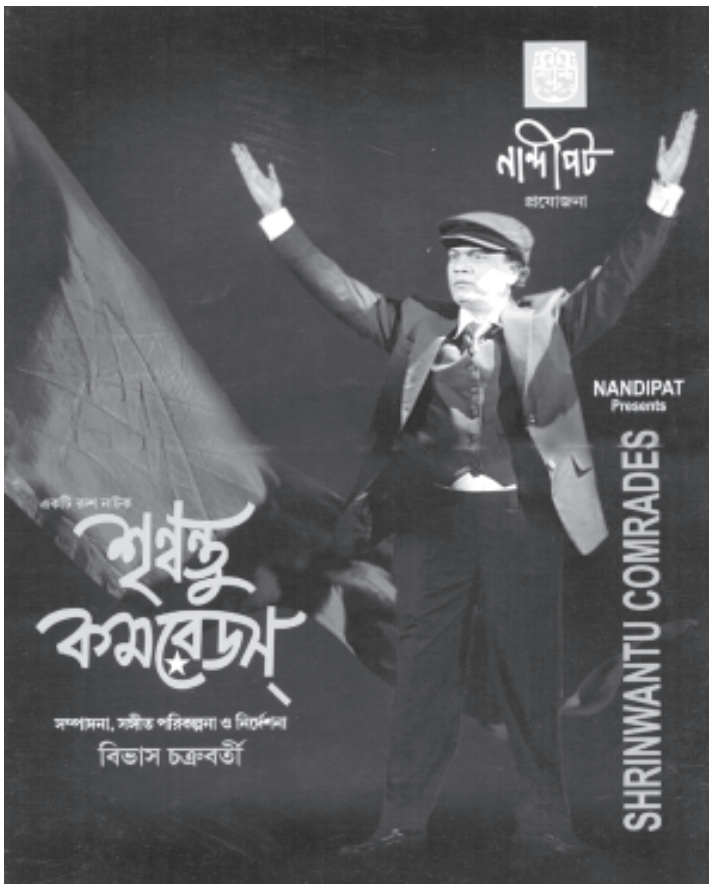

উপলব্ধি করেছিলেন একটি বিশেষ কারণে। কারণটি—সেই সময় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব থেকে শুরু করে যুবকর্মী, যাদের হাতে বিভিন্ন সোভিয়েত পরিচালনার ভার;—সাম্যবাদ, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্র এবং জনগণ সম্পর্কে শিক্ষার প্রতি অপরিসীম অজ্ঞতাই সেদিন লেলিনকে পেনসিল কারাখানার প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়েছিল। লেলিন সেদিন ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, ব্যথিত হয়েছিলেন। আজ ৯০ বছর পর সঙঘবদ্ধ অজ্ঞতার শক্তি যে পৈশাচিক শক্তিকেও হার মানায়, তা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। লেলিন বলেছিলেন, “দেখো, রুশ জনসাধারণের জীবনে শাসকের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে প্রশ্ন করার অধিকার যেন সুরক্ষিত থাকে।’ কিন্তু আজ মার্কসবাদে বিশ্বাসী কমরেডরাই যখন শাসক শ্রেণীর অন্যায় অত্যাচার, অহেতুক রক্তপাত, প্রাণনাশের বিরুদ্ধে আঙুল তোলেন তখন তাঁরা হয়ে যান দালাল। হায়! নববই বছর পরও কমরেডরা মার্কস বুঝলেন না, লেলিন বুঝলেন না। রাজনীতির মানবিক দিক আজ আর নেই। জোটবদ্ধ অজ্ঞতা, ক্ষমতার দম্ভ আর ভ্রষ্টাচার—কোনও দর্শনকেই সফল হতে দেয় না, তা মার্কসবাদই হোক বা গান্ধীবাদ।

যাটের দশকে আমার সঙ্গে যারা ছাত্র রাজনীতি করতেন, তাদের অনেকেই তখন মার্কসবাদের আলোয় আলোকিত। আমরা জাতীয়তাবাদীরা সেইসব আন্তর্জাতিকতাবাদীদের চোখে ছিলাম ‘অশিক্ষিত, ব্রাত্য’। সেইসব কমরেডদের এ নাটক দেখা জরুরী। নাটকের শেষ দৃশ্যে গোর্বাচভ ও ইয়েলৎসিনের কল্যাণে মস্কোর রেড স্কোয়ার থেকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে লেলিনের প্রস্তরমূর্তির ভগ্ন উর্দ্ধাংশটি নিয়ে যাওয়ার ভিডিও চিত্র দেখে তারা চোখ ঢাকবেন। ‘নান্দীপট’কে ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সময়ে এই নাটক বেছে নেওয়ার জন্য। নাটকটি সংলাপপ্রধান। সাধারণ দর্শকদের এ নাটক কতটা ভালো লাগবে জানি না। তবু এমন নাটক জরুরী। নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী এ নাটক কেন বাছলেন, সে বিষয়ে কিছু বলেছেন। সাধারণের জ্ঞাতার্থে সেটুকুও তুলে দিলাম।

নির্দেশকের কৈফিয়ৎ

“....সত্যি বলতে কি, এই সময়টা খুবই মনোকষ্টে কাটছিল আমার। কেন এই কষ্ট, তার কারণ দেখলাম ভাষা পেয়েছে সদ্য-প্রকাশিত একটি নাট্যপত্রে। যেখানে শিব মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ‘সমাজে থিয়েটার তার ছাপ রাখবে। নাট্যকর্মীদের ভাবনা, চিন্তা, সৃষ্টি নাগরিক সমাজকে কোথায় ছোঁবে, ভাবাবে, বদলাবে—এরকম একটা ইচ্ছে সব নাট্যজনের মাথাতেই থাকা স্বাভাবিক। থাকেও।—থাকে কি?’ এখানেই শিববাবুর প্রশ্ন ও উদ্বেগ। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো ‘সাধারণ-ভাবে কলকাতা, এমন কি মফঃসলের থিয়েটারে যে ঝোঁকটা দেখা যাচ্ছে নাটকের বিষয় ভঙ্গীতে, এমন কি

সংগঠনেও, তাতে প্রধানত দর্শককে তোয়াজ করার, দর্শককে তাদের পুরোনো পছন্দে বিনোদন যোগানোর একটা চেষ্টা যেন ক্রমেই পুষ্ট হয়ে উঠছে। নতুন চিন্তায় ভাবানো নয়। চলমান জীবনের ভুল ধরানোও নয়।...আমাদের থিয়েটার তাই দর্শক ধরবার জন্য হাসি, মজা, সেন্টিমেন্ট, নাচ-গান, চটকদার সংলাপ—এইসব নানা মশলায় মাখো মাখো হয়ে উঠতে চাইছে। বিক্রিও হচ্ছে কাউন্টারে। এটাই অবশ্য সার্বিক চিত্র নয়, এই প্রবণতার বাইরে অবশ্যই কিছু নাট্যজন বা কিছু দল এখনও আছেন, কিন্তু মোদ্দা চেহারাটা বোধহয় এরকমটাই।

এসব কথাই বোধহয় মাথায় পাক খাচ্ছিল। কিন্তু যেকথা বলতে চাই—সে রকম নাটকও তো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আবার লিখে নেবার ক্ষমতাও নেই। ঠিক সেই সময় সাত্‌রঙের নাটক এবং প্রকাশের (নান্দীপটের প্রকাশ ভট্টাচার্য) প্রস্তাব বাঁচিয়ে দিল আমাকে। কারণ আমি তো এখন একজন চিহ্নিত ব্যক্তি। যে লোকটা রাজরক্ত, চাকভাঙ্গা মধু, শোয়াইক গেল যুদ্ধে, শ্বেতসন্ত্রাস, মৃত্যু না হত্যা-র মতো নাটক নিয়ে কাজ করেছে, যে এই মুহূর্তে সমসময় নিয়ে কিছু বলতে চাইলে তা যে আগের মতো বিশ্বাসযোগ্য নয়, তার কথাগুলিও যে আর গ্রহণযোগ্য নয়, সেটা প্রমাণ এবং প্রচার করার জন্য কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উঠে পড়ে লাগবে—আমি জানতাম। তাই এমন একজন মানুষকে বেছে নেওয়াই তো শ্রেয় যাঁর চিন্তাধারা এবং উচ্চারণ সততার সঙ্গে, নির্ভেজাল এবং অবিকৃত তুলে ধরলে প্রশ্ন তোলার আগে দু’বার ভাববেন বা ঢোঁক গিলবেন সেই সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

মিখাইল সাত্‌রঙ আমাদের নিয়ে গেলেন ১৯২০ সালের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাশিয়ায়। সেই সময়টির মোকাবিলা কীভাবে করেছিলেন লেলিন, তারই প্রামাণিক এবং জীবন্ত দলিল এই নাটক। ৯০ বছর পর আজও লেলিনের সেই মত ও পথ বোধহয় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বিশ্বের পথভ্রষ্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট আদর্শভ্রষ্ট নষ্ট কমিউনিস্ট দের কাছে, মার্কসবাদ নিয়ে বিভ্রান্ত জনগণের কাছেও। তাই আমরা এই নাটকের নাম দিলাম ‘শৃণ্বন্তু কমরেডস্’। প্রথম শর্ত, শুনতে হবে!”

সবশেষে কয়েকটি তথ্য। রুশ নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৩-৯৪ সালে। অনুবাদটি পড়ে তখনই এটা করার কথা ভেবেছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। গানও লিখিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে। যে কোনও কারণেই হোক তখন নাটকটি হয়ে ওঠেনি। সকলের অভিনয়ই ভালো। তবু লেলিনের ভূমিকায় শ্যামল চক্রবর্তীর অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে।

শব্দরূপ - ৫৪৯ প্রবাহ প্রামাণিক

১		২	■	■	৩		৪
■	■	৫	৬			■	
■	৭	■		■	■	■	
■	৮			■	■	৯	
১০		■	■	১১			■
	■	■	■		■		■
	■	১২			১৩	■	■
১৪			■	■	১৫		

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. ডাক নামে চৈতন্যদেব, ৩. ধনের দেবতা, ৫. অন্য নামে পলাশবৃক্ষ, প্রথম দুয়ে গালা, ৮. বায়ুর দেবতা, ৯. কিরণ, ১০. শিব পূজায় ব্যবহার্য ফলবিশেষ, ১১. দুর্যোধনের কন্যা ও পুরুবংশীয় বিখ্যাত রাজা দুষ্মন্তের স্ত্রী, ১২. ভগবতীর মূর্তি ভেদ—এঁর অন্য নাম মাতঙ্গী, প্রথম দুয়ে তীব্র, শেষ দুয়ে নক্ষত্র, ১৪. বিভীষণের পত্নী, ১৫. স্ত্রী অর্থে সর্পিণী।

উপর-নীচ ঃ ২. বুধ পত্নী, ৩. চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্যবিশেষ, ৪. রামচন্দ্র, ৬. শোধন, শেষ দুয়ে ছোট ঘাসে ঢাকা উদ্যান, ৭. তৎসম শব্দে শিলা, আগাগোড়া পশম, ৯. বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মুনি বিশেষ, ১০. পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র, প্রথম দুয়ে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, ১১. শ্রীরাধিকার জনৈকা সখী, ১২. হিমালয় ও মেনকার কন্যা, ১৩. রাজপুত নৃপতির খেতাব।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৪৭

প	■	■	ঋ	ষ্য	শৃ	ঙ্গ	■
দ	■	■	গ্বে	■	ঙ্খ	■	■
বি	শা	র	দ	■	ল	লা	ট
■	ল	■	■	■	■	খে	■
■	গ্রা	■	■	■	■	রা	■
বা	ম	ন	■	বি	শ্ব	জ	ন
■	■	হু	■	হ	■	■	ভ
■	শে	ষ	না	গ	■	■	গ

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া
বেড়াবেড়িয়া, বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

● ৫৪৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ জুন, ২০১০ সংখ্যায়

আল্লা ভোট দে, জোট দে, নোট দেরে তুই...

শিবাজী গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে সবার মুখে এখন এক কথা—ভোট ভোট ভোট, জোট জোট জোট, আর নোট নোট নোট। অগ্নিমূল্য বাজারদর আর অগ্নিতুল্য গরমও হার মেনেছে ওই ভোট-জোট-নোটের দাপটের কাছে। চারদিকে এখন সাজো সাজো রব উঠেছে, কত ক্যানভাচার জুটেছে, মাছির মতো পিছে পিছে করতেছে ভ্যানভ্যান। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ গ্রাম্য কবি উপহাস করে লিখেছেনঃ

দেখি ট্রামে বাসে রাস্তাঘাটে,
ভোটের ক্যানভাচারের চোটে,
পথিকের বিরক্তি ঘটে,—পথে চলা ভার।
দেখি অসংখ্য নমুনার খেলা,
ছাতি লাঠি দাঁড়িপাল্লা,
লাঙ্গল বলদ বাক্স তালা—কতো নমুনার।।

পৌরসভা হোক, বিধানসভা হোক আর লোকসভাই হোক, দলীয় কর্মীরা যাদের জন্য খেটে খেটে জান কয়লা করছে, সেসব ভোট-প্রার্থীদের কিন্তু একচক্ষু হরিণের মতো একদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ—তা হলো মুসলিম ভোটার তোষণ পোষণ ভজন পূজন। কারণ, তারা মনে করে ২৫ শতাংশ মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক অক্ষত রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে। হিন্দু ভোট ৭৫ শতাংশ হলেও তার জন্য থোড়াই কেয়ার। হিন্দু ভোট সবসময় ভোঁ কাট্টা হবে, যদি মুসলিম ভোট এককাট্টা রাখা যায়।

তাই হিন্দু ভোট প্রার্থীরাও ৭৫ শতাংশ হিন্দু ভোটের জন্য তোয়াক্কা না করে ২৫ শতাংশ মুসলিম ভোটের পেছনে ছুটছে গোস্ত-লুব্ধ কুকুরের মতো। আর হিন্দু ভোটারদের বুদ্ধিশুদ্ধিরও বলিহারি। তারা নিজেদের সর্বনাশ দেখেও দেখছেন না। তারা হিন্দু ভোট-প্রার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না যে, তোমরা তো মুসলমানদের ভালো করার জন্য সবাই কোমর বেঁধে নেমেছে। জন্ম থেকে এন্তেকাল অবধি মুসলমানদের ভালো করার জন্য তোমরা মুচলেখা দিয়ে বসে আছ। কিন্তু হিন্দু সমাজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নেই তোমাদের কাছে।

তাই নানা ধ্বজাদণ্ড ও প্রতীক চিহ্ন ধারণ করে হিন্দু ভোটকে তেভাগা চৌভাগা করে মুসলমান প্রার্থীদের জয়ের পথ পরিষ্কার করার কাজে মেতেছ তোমরা। একটার পর একটা হিন্দু আসন যে হিন্দুদের হাতছাড়া হয়ে মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে সেদিকে তোমাদের কারো হুঁশ নেই। তোমরা এই আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করে হিন্দুজাতির সর্বনাশ করছ, হিন্দুস্থানের সর্বনাশ করছ, জাতির শত্রুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করছ।

> **একটার পর একটা হিন্দু আসন যে হিন্দুদের হাতছাড়া হয়ে মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে সেদিকে তোমাদের কারো হুঁশ নেই। তোমরা এই আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করে হিন্দুজাতির সর্বনাশ করছ, হিন্দুস্থানের সর্বনাশ করছ, জাতির শত্রুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করছ।**

শতকরা ৭৫ জন হিন্দু, অথচ তাদের কেউ গেরাহ্যিই করে না। তারা যেন ভোট-প্রার্থীদের কেনা গোলাম। শা—রা ভোট না দিয়ে যাবে কোথা? ভিটেমাটি ছাড়া করবো না! ভোট যদি না দিবি তবে তোদের ঘরে আগুন দেব, জমির ফসল কাটব, পুকুরে বিষ ঢালব, গোয়ালের গরু কেড়ে নেব, তোর জরুর শাড়ী টানব, মেয়ের ইজ্জত লুটব; তবে যদি সিধা হোস। লাল তেরঙা ঘাসফুল যে রঙেরই হোক ২৫ শতাংশ মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক কব্জায় রাখতে ৭৫ ভাগ হিন্দু ভোটারের চোখে সরষে ফুল ভাইকে পর করে পরকে নিয়ে ঘর করার দুর্বুদ্ধি যাদের ধরেছে, তাদের কে বাঁচাবে? যারা জেনে শুনে বিষ পান করে তাদের প্রাণের আশা করা বৃথা।

সুতরাং লাল, তেরঙা, ঘাসফুলে মিলে চলছে তেভাগা আন্দোলন। ৭৫ শতাংশ হিন্দু ভোট ভাঙার জন্য কাড়াকাড়ি। মারামারি। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় হিন্দু-যুবকের মৃতদেহ; মণ্ডল, দাস, মাহাতো, বাউরী, সাঁতরা, মুখার্জী, ব্যানার্জী, সামন্ত, দুলে, ভাস্কর, লোধা, শবর, মুণ্ডা, মারাণ্ডী, সোরেন ইত্যাদি উপাধিধারী ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ বংশ-গোষ্ঠীভুক্ত হিন্দু যুবকদের মরা মুখ। হিন্দুদের ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় গৃহবিবাদ ঘটিয়ে দিয়ে পাড়াকে পাড়া হিন্দু শূন্য হয়ে যাচ্ছে—আর সন্তানহারা পিতামাতার চোখের জল মোছাতে নেতা-নেত্রীরা গামছা হাতে ছুটছে। এবং বদলা নেবার জন্য ইন্ধন জোগাচ্ছে।

দিনে রাতে যে হিন্দুর রক্তপাত ঘটছে, বংশ লোপ হয়ে যাচ্ছে তাতে কলকাতাবাসী কোনও দলের হিন্দু নেতা-নেত্রীদের মাথাব্যথা নেই—তাদের ভোটের বাক্সপূর্ণ হলেই হলো। এক একটা তাজা জোয়ান বুলেটের/বোমার ঘায়ে লুটিয়ে পড়লেই নেতা-নেত্রীর চোখ আনন্দে ঝলমলিয়ে ওঠে। মৃতদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। সহানুভূতির ভোট কুড়িয়ে আসনটি দখল করার আশায় বুক বাঁধে নেতা-নেত্রীরা। স্বজনহারাদের চোখের জলে তাদের ভোট-বাক্স পূর্ণ হলেই তারা তৃপ্ত।

কংগ্রেস, তৃণমূল আর সিপিএম—যে নামধারীই হোক এরা যে হিন্দু পরিচালিত দল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, দলের পরিচালকবর্গ যে হিন্দু তা তাদের নাম ও উপাধিতেই পরিষ্কার। দলে দু'একগাছা মুসলমান থাকলেও তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ওটা শুধু মুসলমানদের মন ভেজানোর জন্য—মূল লক্ষ্য ২৫ শতাংশ মুসলমান ভোট। তাদের খুশি করার জন্য হিন্দু নেতারা তো উঠে পড়ে লেগেছে—মাছ কাটলে মুড়ো দেব, গাই বিয়ালে দুধ দেব, চাকরিতে সংরক্ষণ দেব, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানেই-যা কিছু আছে, তাতেই তোমাদের অগ্রাধিকার দেব। কিন্তু মুসলমান ভোটটা যেন ভাগাভাগি না হয়, সব আমার দলের পক্ষে পড়ে।

আর হিন্দু ভোট! ফুঃ। তিন ভাগ চার ভাগ হয়ে তো ৭৫ শতাংশ হলেও তার কোনও গুরুত্ব নেই। তার উপর সেকুলারি সোমরস পান করিয়ে ব্যাটাদের বুদ্ধিবৃত্তি এমন ভোঁতা ও অসাড় করে রেখেছি যে, নিজেদের ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু নেতা-নেত্রীরা নেশাগ্রস্ত হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারালেও সাধারণ হিন্দু তো কাণ্ডজ্ঞান হারাননি। তারা একটু চোখ খুলে দেখুন সর্বনাশের কোন্ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ভেবে দেখুন কাকে ভোট দিচ্ছেন, আখেরে কি পাচ্ছেন।

দলদাস কর্মীরা হতে পারে; কিন্তু সাধারণ ভোটার তো দলদাস নয়। কাণ্ডজ্ঞানটা একেবারে বিসর্জন না দিয়ে গোপন ব্যালটের মর্যাদা রক্ষা করুন। হিন্দুর স্বার্থ যে দেখবে তাকে ভোট দিন। যেখানে একাধিক হিন্দু প্রার্থী, সেখানে দল ও ধ্বজার দিকে না তাকিয়ে উপযুক্ত প্রার্থীকেই বেছে নিন। হিন্দুর জন্য যার প্রাণ কাঁদে হিন্দুর স্বার্থে ঘা লাগলে যে ব্যথা পায় দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দুর সাহায্যার্থে যে প্রার্থী প্রাণপণ করে এগিয়ে যায়, দলমত নির্বিশেষে তেমন হিন্দু প্রার্থীদেরই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন—যাতে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী না থাকতে হয়।

শোক সংবাদ

গত ১৩ মে হুগলি জেলার সিঙ্গুরে নিজ বাসভবনে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও অধ্যাপক

জগদীশ চন্দ্র নন্দী। পিতৃদেব নিখিলশাস্ত্রাধ্যাপক রমেশ চন্দ্রের সুযোগ্য সন্তান জগদীশবাবুর পড়াশুনো কলকাতা ও লণ্ডনে। সারাজীবন বহু সম্মান অর্জন করেছেন তিনি। অযোধ্যা সংস্কৃত কার্যালয় তাঁকে দিয়েছে সাহিত্যভূষণ উপাধি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

* * *

মালদা জেলার আবাল্য স্বয়ংসেবক এবং বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য অসীম চক্রবর্তী গত ১২ মে নিজ বাসভবনে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ কর্কট রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। মা, স্ত্রী ও এক পুত্রসহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেলেন তিনি।

* * *

হাওড়া জেলার বাগনান মহকুমার ধর্মজাগরণ বিভাগের সংযোজক সুরজিৎ দাসের পিতা প্রশান্ত দাস গত ১১ মে মধ্যরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা-কে রেখে গেছেন তিনি।

* * *

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকের মাতৃদেবী ভারতী ঘোষ গত ৬ এপ্রিল পরলোক গমন করেন। তাঁর ছয় পুত্র, দুই কন্যাসহ নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

* * *

গত ২২ মে সঙ্ঘের দক্ষিণ অসম প্রান্তের করিমগঞ্জ বিভাগ শারীরিক প্রমুখ অভিমন্যু নুনিয়ার পিতৃদেব রামস্বরূপ নুনিয়া হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে হাইলাকান্দি জেলার আয়নাখালস্থিত নিজ বাসভবনেই দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। কর্মজীবনে রেলে কর্মরত ছিলেন। তাঁর চারপুত্র, তিন কন্যা বর্তমান।

পরাজয়ের জন্য ছুটে চলেছে

(৫ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কথায় বুদ্ধবাবু সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়াতে গিয়ে কলকাতায় একটি বিমান বন্দর নির্মাণের জন্য এক শিল্পপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে (কনসর্টিয়াম-এর সঙ্গে) মউ স্বাক্ষর করে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, আজ আমার জীবনের সব থেকে আনন্দের দিন। নিরুপমবাবুদের বক্তব্য—"বিমান বন্দর নির্মাণ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীন। তাই ভুলপথে চলছেন বুদ্ধবাবু।" এই ভাবেই বুদ্ধবাবু মনমোহন সিং এবং মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার কথা এবং পরামর্শ মানতে লাগলেন। তাঁদের বক্তব্য, বুদ্ধবাবু মনমোহন-প্রণববাবুর কাছে গদগদ হয়ে পড়েন। কেন?

প্রকাশ কারাত নিজের রাজনৈতিক কবজা দৃঢ় করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করছেন। তাঁর বিরুদ্ধমতের এবং বুদ্ধবাবুর সমর্থক সীতারাম ইয়েচুরি সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করছেন। সীতারাম ইয়েচুরি তাঁর এক বন্ধুর পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে ইউপিএ সরকারকে চাপ দিয়েছিলেন এবং একের পর এক বহু সুযোগ সুবিধা নিয়েছিলেন বলে কথা উঠেছে।

প্রকাশ কারাত-পিন্নাই-নিরুপম-মানিক সরকার-পান্ধে বুদ্ধবাবুর বিরুদ্ধে আছেন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটিতে বুদ্ধবাবুর বিরুদ্ধে শ্যামল চক্রবর্তী, নীলোৎপল বসু, তপন সেন (সিটুর সাধারণ-সম্পাদক) ও হান্নান মোল্লা মুখ খুলেছেন। এ কথা ভাবা যায় যে আগামী আগস্ট মাসে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটি প্লেনামে বিমান-বুদ্ধ-বিনয়-এর যুগের অবসান হতে পারে। উঠে আসতে পারে রাজ্য-সিপিএম-এর বর্ধমান লবি (যাতে বিনয় কোঙার থাকবেন না)।

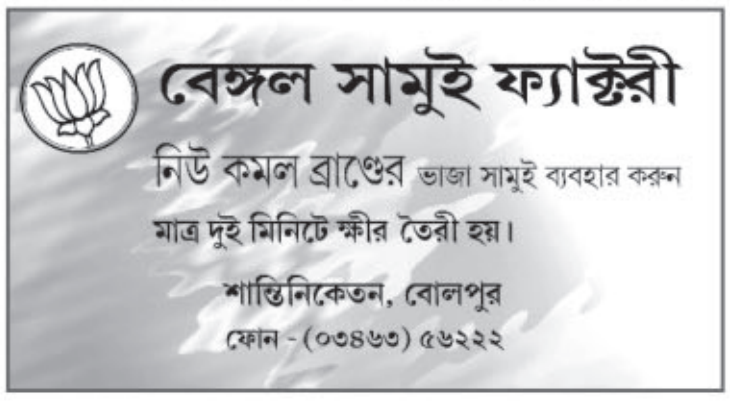

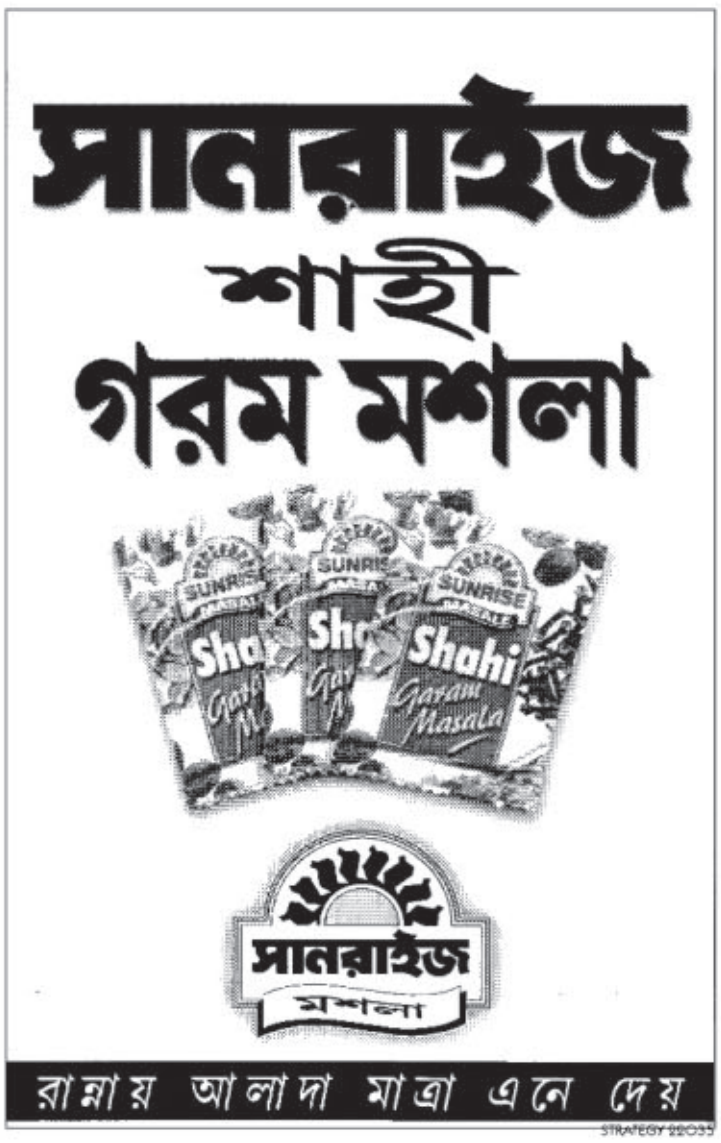

Swastika
31 May - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

KARNATAKA

GOVERNMENT OF KARNATAKA

Abundant Resources, Multiple Opportunities

Sri B.S. Yeddyurappa
Hon'ble Chief Minister

Sri Katta Subramanya Naidu
Hon'ble Minister for Housing
BWSSB, IT & BT and Information

Global Investors Meet - 2010

3rd - 4th June - Bangalore, India

Karnataka is not only the land of gold and aroma, but also a most prominent land of multiple opportunities. Recognized world over as the knowledge hub of Asia, this State offers opportunities on all fronts to the investors with its huge potential.

Karnataka with a vast area of 1,92,000 sq. kms. enjoys salubrious weather conditions all through the year, & is a home of cosmopolitan culture.

Added to this, the dynamic leadership of good governance under **Sri B.S.Yeddyurappa**, with the futuristic & progressive policies is all set to welcome investors from across the world to the ensuing **Global Investors Meet 2010 to Karnataka - the knowledge hub of Asia.**

Come, stay, start & soar to a new height of prosperity.

Features at a glance with opportunities

Bountiful nature, skilled man power, reputed re search and development institutions, wide network of good roads, rails, airports and ports.

Infrastructure :	●	State ranks first in infrastructure PPP projects
	●	Rs.11,000 crore annual investment (4.5% of State GDP)
	●	Portfolio of 102 PPP infrastructure projects
IT & BT :	●	The pivot of the economic development of the State
	●	Bangalore given the sobriquet, **'Silicon Valley of India'**
	●	The most preferred destination for IT & BT·

For further information on
Global Investors Meet - 2010
Please Contact :

KARNATAKA UDYOG MITRA
(Government of Karnataka Undertaking)
E-mail : kum@kumbangalore.com
Website : **www.kumbangalore.com**

Development the key word of administration

Meet your future with us - We help you make it prosperous!

karnataka information

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com